সাধুসন্তের
জীবনে
অলৌকিক
রহস্য

সাধুসন্তের জীবনে অলৌকিক রহস্য

(দ্বিতীয় খণ্ড)

স্বামী দিব্যানন্দ

নতুন মুদ্রণ : চৈত্র, ১৩৮৮।

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক
শ্রীব্রজলাল চক্রবর্তী
মহামায়া প্রেস
৩০/৬/১ মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ গৌতম রায়

দাম ॥ ষোল টাকা

বিষয়সূচী

স্বামী দিব্যানন্দের অন্যান্য গ্রন্থ

- পরলোক ও প্রেততত্ত্ব
- তন্ত্র রহস্য

শিরদির সাইবাবা

★ ★ ★ ★ ★ ★

শিরদির সাইবাবার আধ্যাত্মিক জীবন সুরু হয় অতি অল্প বয়সে এবং সুরু হয় তা একজন সুফী মুসলমান ফকিরের আশ্রয়ে—যদিও সম্ভবতঃ হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরেই তার জন্ম। চার পাঁচ বৎসর পর সেলুর গোপাল রাও হ'ন তাঁর দ্বিতীয় গুরু। তরুণ সাইবাবাকে দেখেই তাঁর মনে হয়েছিল সন্ত কবিরই এসেছেন আবার এ নতুন দেহ ধরে। গোপাল রাও যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করবার পূর্ব-মুহূর্তে সাইবাবাকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করবার ইঙ্গিত দিয়ে যান।

গুরুর নির্দেশ মত পশ্চিমে চলতে চলতে শিরদিতে এসে হাজির হ'ন তিনি। এখানকার শান্ত মনোরম পরিবেশে একটি মন্দির দেখতে পেয়ে সেখানে উঠতে যান বাবা, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে মুসলমান মনে করে সেখানে ঢুকতে দেন না। বাধ্য হয়ে, তাকে এক গাছতলায় আশ্রয় নিতে হয় তখনকার মত। এরপর শিরদি ছেড়ে চলে যান তিনি, আবার আসেন। আবার যান, আবার আসেন। এমনি করে কয়েক বার ওখানে যাতায়াত করবার পর অবশেষে ১৮৭২ সালে ওখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান। আস্তানা হয় তাঁর ওখানকার এক পুরানো জীর্ণ মসজিদে।

ওখানে সবসময়ই একটা ধুনি জ্বালিয়ে রাখতেন তিনি, আর রাত্রে জ্বালিয়ে রাখতেন মাটির প্রদীপ। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই রেওয়াজ আছে ঈশ্বরোপাসনার জায়গায় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা। জীবনধারণের জন্য সামান্য যা কিছু প্রয়োজন তা তিনি লোকের কাছে ভিক্ষা করে সংগ্রহ করতেন। রাত্রের প্রদীপের জন্য তেলের ব্যাপারেও তাই। আধ্যাত্মিক সাধনার রাজ্যে তিনি কোন

স্তরের লোক সে খবর তখনকার খুব কম্ লোকেই রাখত। যারা তাঁর দিব্য ভাবের কথা জানতো তারা তাঁকে প্রণাম জানাতে সেলাম জানাতে আসত, বাকী সবাই তাঁকে মনে করত একটা পাগলা ফকির।

যা'ক,—এবার যেদিন তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রথম পরিচয় পেল স্থানীয় লোকেরা, সেদিনকার কথায় আসা যা'ক।

রাত্রে বাবা মসজিদে যে সব প্রদীপ জ্বালাতেন তার জন্য তেল সংগ্রহ করতেন তিনি এক দোকানীর কাছ থেকে। দোকানী বিনি পয়সায়ই তাঁকে এই তেল দিত। একদিন বাবা অন্যদিনের মত তেল চাইতে গেলে সে মিথ্যে করে বললে, আজ তেল নেই। কাছে পিঠে আরও অনেক লোক ছিল। দোকানী হয়ত তাদের একটু মজা দেখবার জন্যেই সেদিন এই মিছে কথাটা বলেছিল।

তেল নেই শুনে বাবা তাঁর আস্তানা মসজিদের দিকে চললেন। পাগলা ফকির তার ধর্ম্মের পিদীম জ্বালাতে না পেরে কি করে তাই দেখে একটু হাসাহাসি করবার জন্যে দোকানী তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বাবার পিছু পিছু এল।

মসজিদে কলসী বা জালাতে লোকের উজু করবার জন্য যে জল থাকে,—দোকানী এবং তার সঙ্গীরা সন্ধ্যার অন্ধকারে দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে—বাবা তা থেকে জল নিয়ে প্রদীপগুলিতে ঢালছেন, তারপর সেগুলির সলতেতে আগুন দিতেই সেগুলি জ্বলে উঠল। এরপর প্রদীপগুলি তেল দেওয়া প্রদীপের মত জ্বলতেই থাকল। দোকানী এবং তার সঙ্গীদের বুঝতে বাকী থাকল না যে বাবা তার অলৌকিক শক্তিবলে জলকে তেলে রূপান্তরিত করেছেন। দেখে বিস্মিত দর্শকেরা ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, তিনি যেন তাদের অভিশাপ না দেন, ক্ষমা করেন।

সাইবাবার এ আশ্চর্য অলৌকিক শক্তির কথা গ্রামের আশেপাশে এবং দূরে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোক আসতে সুরু করল তাঁর

কাছে। কেউ বা তার চেলা হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করতে চায়, কেউ চায় রোগমুক্তি, কেউ বিপদ-মুক্তি।

মসজিদে সব সময় তিনি যে ধুনি জ্বালিয়ে রাখতেন তা থেকে যে ভস্ম পাওয়া যেত তাকে বলতেন তিনি উধি। এই উধি দিয়ে তিনি অনেক কিছু অলৌকিক কাজ করতেন, বিশেষ করে এই উধির সাহায্যেই তিনি নানা কঠিন রোগগ্রস্থ ব্যক্তির রোগ নিরাময় করতেন।

শুধু রোগ নিরাময় নয়, দুঃখ কষ্ট বিপদে পড়ে কেউ তাঁর কাছে এলে বা দূর থেকে তাঁকে স্মরণ করলে বা তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তাঁর অলৌকিক সিদ্ধিবলে—তিনি তা দূর করতেন। স্থূল দেহে শির্দিতে অবস্থান করেই তিনি নিজেকে স্মরণকারী অনেক দূরের লোকের কাছে উপস্থিত হতে পারতেন, সব সময় অবশ্য স্বমূর্তিতেই নয়, কখনও ভিক্ষুক, কখনও সাধু, কখনও মজুর, কখনও বা ইতর প্রাণী কুকুর, বেড়াল ইত্যাদির মূর্তি ধরে।

সংস্কারবদ্ধ সংসয়ী লোকের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করতে তাঁকে অনেক সময় তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ তাঁকে দর্শন করতে এসে মসজিদে প্রবেশ করতে দ্বিধা করছিলেন। তখন মসজিদের বাইরে থেকে বাবাকে দেখলেন তিনি তাঁর ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তিতে। এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি ছুটি মসজিদে গিয়ে বাবার চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

প্রভু যীশুখৃষ্টের মত ভূতে পাওয়া রোগীর দেহ থেকে তিনি ভূত তাড়াতে পারতেন, অন্ধকে দৃষ্টিদান এবং পক্ষাঘাত, কুষ্ঠ ইত্যাদি কঠিন রোগগ্রস্থ রোগীকে রোগ মুক্ত করতে পারতেন। বাগোজী নামে একটি লোকের কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল। রোগের বাড়াবাড়ি অবস্থা। সে বাবার পরম ভক্ত, রোজ এসে তাঁর পদসেবা করত। এ দৃশ্য দেখে অন্যান্য ভক্তেরা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল: বাগোজীর

দু'জন তখন তা থেকে অঞ্জলি ভরে জল পান করে সেদিন নিজেদের প্রাণ রক্ষা করলেন।

এর কয়েকদিন পরে নানাসাহেব যখন শিরদিতে এলেন তখন তাঁকে দেখেই সাইবাবা স্মিত হাস্যে বলে উঠলেন কি হে নানা, সেদিন পাহাড়ে তোমার তেষ্টার জল মিলেছিল ত? দেখলে ত,—ভগবানের কৃপা থাকলে পাথরের ভেতর থেকেই জল বেরোয়, কষ্ট করে আর কুয়ো খুঁড়তে হয় না।

বাবার আশেপাশে কয়েক জন ভক্ত বসে ছিলেন,—তাঁদের মনে পড়ল কয়েক দিন আগে দুপুরে বাবা হঠাৎ বারবার বলে উঠেছিলেন, তাইত আমাদের নানা যে তেষ্টায় মরে যাচ্ছে—কি করা যায়।

ভক্তেরা সেদিন এ কথার মর্ম বুঝতে পারেন নি! আজ তাঁর মুখের এ রহস্যপূর্ণ উক্তি শুনে তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। এরপর নানা সাহেব যখন সেদিনকার সব কথা খুলে বললেন,—তখন কারোরই আর বুঝতে বাকী রইল না—কি করে ঐ রুক্ষ পাহাড়ে সেদিন তাঁর তেষ্টার জল মিলল।

• * • •

বি, ডি, দেব সাইবাবার পরম ভক্ত। থাকেন তিনি শিরদি থেকে দূরে দাহান্থ বলে একটা জায়গায়। ধর্মপ্রাণ দেবের বড় ইচ্ছা হয়েছে এইখানেই তিনি সাড়ম্বরে একটা মহোৎসব করেন। আর তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা সাইবাবা—এ উৎসবে উপস্থিত থাকেন। তাঁর এ অভিলাষ জানিয়ে পর পর কয়েক খানা পত্রও লিখলেন তিনি বাবাকে। উত্তরে বাবা জানালেন—তিনি নিশ্চয়ই এ উৎসবে হাজির হবেন :—সঙ্গে আরো দু'জন ভক্ত থাকবে তাঁর।

চিঠিতে এ খবর পেয়ে ভক্ত দেব মহা খুশী।

বাবা আসবেন—এই আনন্দে মহোৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন তিনি বেশ ভাল মতোই করলেন, কোন ত্রুটি রাখলেন না।

কিন্তু উৎসবের দিন দেখা গেল—বাবা এলেন না। দেবের মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। উৎসবে অনেক সাধুসন্ত যেমন এলেন, তেমনি এলেন অপূর্ব সৌম্যদর্শন এক সন্ন্যাসী, সঙ্গে তাঁর দুই চেলা। এই সন্ন্যাসী এসেই শ্রীদেবকে বললেন, শুনুন আমরা শুধু ভোজন করব, কোন দক্ষিণা নিতে পারব না।

আহারান্তে সাধুসন্ত সন্ন্যাসী যে যার মত চলে গেলেন। অন্য সব দিক দিয়ে অনুষ্ঠান বেশ ভালভাবেই উদযাপিত হ'ল বলা যায়। ভক্ত শ্রীদেবের মনে তবুও খেদের অন্ত রইল নাঃ তার বাড়িতে সাইবাবার চরণ ধূলি পড়ল না।

নিজের নিদারুণ দুঃখ জানিয়ে চিঠি লিখলেন তিনি শিরদিতে—কই বাবা ত এলেন না। আসবেন বলে তিনি নিজ মুখে কথা দিয়ে ভক্তকে শেষে তিনি এমনি করে বঞ্চনা করলেন।

শিরদিতে চিঠিখানা বাবাকে পড়ে শোনানো হ'লে তিনি বললেন, তোমরা দেবকে লিখে দাও, আমি ত দু'জন সঙ্গী নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে তাঁর মহোৎসবে ঠিকই হাজির হয়েছিলাম, ভোজন করেও এসেছি, কিন্তু সে আমাকে চিনতে পারে নি। সে যেন মনে করে দেখে আমি তাকে বলেছিলাম আমরা শুধু ভোজন করব, কোন দক্ষিণা নিতে পারব না।

* * * *

উত্তর ভারতের এক প্রধান জজের কথা। ভদ্রলোক বিশেষ ধর্মপরায়ণ। ভদ্রলোক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও নারায়ণ মূর্তি তার বড় প্রিয়। বারো বৎসর ধরে প্রতিদিন তিনি এই মূর্তি পূজা করে আসছেন, ধ্যান করে আসছেন। একদিন হঠাৎ তাঁর যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল তার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

আমি নিজের বিছানায় শুয়ে আছি, হঠাৎ ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপারঃ দেখলাম আমার দেহটা যেন আমার সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে, আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রভু

নারায়ণ। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর দেখি নারায়ণ মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে এক সাধু। এ সাধুকে আমি এর আগে আর কোনদিন দেখি নি। প্রভু নারায়ণ নবদৃষ্ট সাধুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ইনি হচ্ছেন সাইবাবা, তোমার অধ্যাত্মজীবনের আশ্রয়, তুমি এর স্মরণ নাও।

এরপর চোখের সামনে ভেসে উঠল আর এক নবতর দৃশ্য : আমি যেন শূন্যমার্গে ভেসে যাচ্ছি! কোন এক মহাশক্তি আমাকে এমনি করে ভাসিয়ে শিরদির মসজিদে সাইবাবার সামনে এনে ফেললো। সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছেন মহাপুরুষ। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, কি গো, আমাকে দর্শন করতে এসেছ? ভাল, ভাল। আমি যে তোমার দেনদার গো। আগের জন্মের দেনা রয়েছে, তা যে মেটাতে হ'বে আমার!

এরপর বাবার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় যখন তাঁর ঘটল তখনকার কথা। শিরদিতে এসে বাবাকে দেখেই তিনি বুঝলেন—এই স্থানে এই মহাপুরুষকেই তিনি সেদিন ভাবগ্রস্ত অবস্থায় দেখেছেন। বাবাকে ভক্তিভরে প্রণাম করতেই কিন্তু বাবা অকস্মাৎ তাঁকে বলে উঠলেন, এ আবার কি, এমনি করে মানুষের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবার কি দরকার? মানুষ আবার মানুষকে ভজনা করবে কেন?

বাবার মুখে হঠাৎ এ কথা শুনে জজসাহেবের বুকটা কেঁপে উঠল : ইনি দেখছি অন্তর্যামী। কোন কথাই এঁর কাছে গোপন থাকবার উপায় নেই। আসলে দর্শনার্থীর মনে মনীষা আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছিল আধুনিক শিক্ষার অভিমান। তাই চিরদিনই তিনি মনে ভেবে এসেছেন কোন মানুষের পায়ে কোনদিন মাথা নোওয়াবার প্রয়োজন নেই। তাঁর সেই মনোভাবটি লক্ষ্য করেই তাঁর প্রতি বাবার এই তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তি।

বাবার উক্তি শুনে জজসাহেবের মনে হচ্ছে—সত্যিই ত এই মনোভাব নিয়ে সাইবাবাকে দর্শন করতে আসা তাঁর ঠিক হয় নি।

কিছুটা অনুতাপ কিছুটা দুঃখ কিছুটা ক্ষোভ নিয়ে কক্ষের এক-প্রান্তে তিনি নতমস্তকে নীরবে বসে রইলেন, বাবার কাছে যেতে সাহস পাচ্ছেন না। খেয়ালী মহাপুরুষ ক্রুদ্ধ হয়ে কখন কি বলে বসেন তার ঠিক কি!

দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেল, মসজিদে যারা এসেছিলেন একে একে তখনকার মত তারা বিদায় নিলেন। এবার জজসাহেবকে একান্তে পেয়ে বাবা স্নিগ্ধ স্বরে তাঁকে কাছে ডাকলেন। জজসাহেব নিকটে আসতেই বাবা পরম স্নেহে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ওরে তুই তো আমার সন্তান, আমার স্নেহের পুত্তলী। ঘরের মাঝে যখন এক গাদা লোকের ভিড় তখন কি বাপবেটার মধুর সম্ভাষণ হয় রে! এই জন্যই ত আমি আমার নিজের ছেলেকে দূরে সরিয়ে রেখে ছিলাম। বোস, এবার তুই আমার কাছে বোস।

প্রভু নারায়ণ তাঁকে তাঁর যথার্থ আশ্রয় দাতারই সন্ধান দিয়েছেন ভেবে জজসাহেবের দুই চোখে তখন পুলকাশ্রুধারা বইতে লাগল।

• • ০ ০

বাবার অন্তর্যামিত্বের পরিচয় তাঁর অনেক ভক্তই পেয়েছেন, বিশেষ করে পেয়েছেন নানা সাহেব—ছোট বড় অনেক ব্যাপারে। দুই একটির কথা এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে।

একবার বাবা মসজিদে শুয়ে রয়েছেন, অন্তরঙ্গ ভক্ত নানা সাহেব তাঁর পাশে বসে, এমন সময় বাবার এক সেবক ভক্ত এসে খবর দিল দু'জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা তাঁকে দর্শন করতে চান।

এই কথা শুনেই নানাসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, পর্দানশীল মুসলমান মহিলা হয়ত তাঁর সামনে বিব্রত বোধ করবেন।

বাবা নানাসাহেবকে বললেন, না, তোমার যাবার দরকার নেই, তুমি বসো, এইখানেই থাক, আমার দর্শনে যারা আসবে আমার ভক্তদের কাছে তাদের লজ্জা করা চলবে না, লজ্জা করে তো তারা চলে যেতে পারে।

বাবার কথায় নানা সাহেব আমার পাশেই বসলেন। মহিলা দু'জন বাবার সামনে এসে ভক্তিভরে বাবাকে প্রণাম নিবেদন করলেন। দুই মহিলার মধ্যে একজন তরুণী এবং অপরূপ সুন্দরী। বাবার সঙ্গে কি কথা বলার সময় একবার তাঁর মুখের অবগুণ্ঠনটি তিনি তুলে ধরলেন, অমনি সেখানে যেন এক অদ্ভুত রূপের ঝলক খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মহিলা তাঁর মুখ ঢেকে ফেললেন। কিন্তু তাকে একবার দেখে নানা সাহেবের আশ মেটেনি, তার কেবলি তখন মনে হচ্ছে আর একবার যদি এই রূপসীর মুখখানা দেখতে পেতাম। আর একবার কি এর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে না?

এই কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা তার জানুতে এক ক্ষুদ্র চপেটাঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানার চিন্তায় ছেদ পড়ল, সজাগ হ'লেন তিনি: সর্বনাশ, অন্তর্যামী বাবার পাশে তার মনে একি ভাব জাগছে।

দর্শনের পর মহিলা দুটি চলে গেলে বাবা বললেন, নানা, তুমি কি বুঝতে পেরেছ কেন তোমায় আমি চপেটাঘাত করলাম?

বুঝব না? বাবা, আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার কাছে কোন কিছু কি গোপন থাকে? কিন্তু বাবা, এই ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে, আপনার মত মহাপুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার সময়ও আমার মনে এমন ভাব জাগল।

বেটা, এতে ঘাবড়ে যাবার, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তুমি মানুষ, রক্তে মাংসে গড়া তোমার দেহ। মানুষের দেহ ও মনে কামনা বাসনার অন্ত নেই। কোন লোভের বস্তু সামনে দেখলে এমন কি সাধকদেরও সুপ্ত কামনা জেগে ওঠে।

একটু চুপ করে থেকে মহাপুরুষ বললেন—অবশ্য ঈশ্বরসৃষ্ট যে কোন সুন্দর জিনিসের দিকে তাকাবার তোমার অধিকার আছে কিন্তু রূপ ও সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় ভাবতে হবে এমন সৌন্দর্য যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কত বড় ওস্তাদ,

কি তাঁর রুচি-জ্ঞান। এই সৌন্দর্যের আধার যিনি তৈরী করেছেন তিনি নিজে কত সুন্দর, কত মহিমময়। বিশ্বের যাবতীয় রমনীর আধারে আধেয়রূপে তিনিই বিরাজ করছেন।

শোন নানা, তোমার রূপতৃষ্ণাকে তুমি যদি এভাবে চালিত করতে শিখতে তা হ'লে ঐ সুন্দরী নারীর মুখখানা আর একবার দেখবার জন্য তুমি লুব্ধ হ'তে না, মনে পড়ত তোমার সেই চিরসুন্দর পরমসুন্দর পুরুষোত্তমের কথা। আমার আজকের এ কথাগুলি স্মরণে রাখবার চেষ্টা করো।

নানাসাহেব বারবার বাবার অন্তর্যামীত্বের পরিচয় পেয়েছেন। আর একবারের কথা—

নানা সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীকে বাবা একবার বলেন, দ্যাখো কোন অভাবে পড়ে কেউ যদি তোমাদের কাছে কিছু চায় তা তোমরা দিতে চেষ্টা করবে, আর দেবার সামর্থ্য যদি তোমার না থাকে তবে অকপটে মধুরভাবে প্রার্থীকে সে কথা বুঝিয়ে বলবে। তা হ'লে তার আর তেমন দুঃখ লাগবে না। গরীব বলে কাউকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ঠাট্টা বিদ্রুপ করো না, চেয়েছে বলে তার উপর চটেও যেও না।

মনে থাকবে এ কথা?

নানা সাহেব এবং তার স্ত্রী বললেন—এ কথা অবশ্য তাদের মনে থাকবে।

বাবার সামনে একথা মুখে বললেও নানা সাহেব কিন্তু বাবার কথামত কাজ করতে পারেন নি। শিরদির কাছেই কোপারগাঁ বলে গ্রাম। সেখানে রয়েছে দত্তাজীর মন্দির। এক বিশিষ্ট সাধু এই মন্দিরের তত্ত্বাবধান করেন। তিনি মন্দিরের সিঁড়ি তৈরীর জন্য নানা সাহেবের কাছে কয়েক শত টানা চান, নানা সাহেব কথা দেন এ টাকা তিনি শীগগিরই দেবেন। নানা ঝঞ্ঝাটেই হ'ক আর যে কারণেই হ'ক মন্দিরের সাধুকে সে টাকা আর তার দেওয়া হয় নি।

এর পর একদিন বাবার দর্শনের জন্য নানা সাহেব শিরদিতে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, যাবার পথেই পড়ে দত্তাজীর মন্দির। বরাবরের অভ্যাস দত্তাজীর পূজা দিয়ে তবে তিনি শিরদির দিকে অগ্রসর হ'ন। কিন্তু এবার মনে রয়েছে সঙ্কোচ—মন্দিরের সাধুকে টাকা দিতে চেয়ে তিনি দেন নি তাই এবার মন্দিরের পথে না গিয়ে আর এক ঘুরো পথে তিনি শিরদিতে এসে হাজির হ'লেন।

শিরদিতে এসে বাবাকে প্রণাম করে তিনি তার পায়ের কাছে বসলেন, কিন্তু বাবার মুখে আগেকার মত আর সেই হাসি নেই। দেখা হলেই বাবা আগে যেমন স্বাগত সম্ভাষণ করতেন এবার আর সে সব কিছু হ'ল না। বাবার মুখ বড় গম্ভীর, মন যেন রুষ্ট।

নানা সাহেব বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, বাবা, আজ আমার এমন দুর্ভাগ্য কেন, কোন কথাই যে বলছেন না আমার সঙ্গে ?

উত্তরে বাবা বললেন, যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না, তাদের সঙ্গে আমি কোন বাক্যালাপ করতে চাই নে।

এ কথা কেন বললেন, বাবা, আমি সব সময়ই তো নিজের সাধ্য মত কথা রাখতে চেষ্টা করি !

তাই যদি হয় তা হ'লে তুমি আজ দত্তাজীর মন্দির এড়িয়ে দূরের পথ দিয়ে এখানে এলে কেন ? কোপারগাঁয়ের সাধুর কাছে তুমি কথা দিয়েছিলে দত্তাজীর মন্দিরের সিঁড়ি তৈরী করতে তুমি তিন শো টাকা দেবে। সে কথা রাখলে তুমি ? সামান্য ক'টা টাকার জন্য বিগ্রহ দর্শন না করেই তুমি এখানে এলে ? এমন নীচু মন যাদের, তাদের সঙ্গে কথা বলতে প্রবৃত্তি হয় না আমার।

অনেক সাধ্য সাধনা অনুনয় বিনয়ের পর নানা সাহেব সেবারের মত বাবার ক্ষমা লাভ করেন।

° • • •

দূরে থাকলেও নানা সাহেবের আর একটা আচরণের ত্রুটি বাবার অজানা থাকে না।

দীন-দরিদ্র ভিখারীদের প্রতি বাবার মমতার অন্ত ছিল না। তাই নানা সাহেবকেও একদিন তিনি বলেছিলেন, দেখ নানা,—কোন ভিখারী তোমার বাড়ি খাবার বা অর্থ চাইতে এলে তোমার সাধ্যমত তাকে তাই দেবে। তার কোন কিছুতে বিরক্তি বা রাগ দেখাবে না।

নানা সাইবাবার এ উপদেশ ভুলে গিয়ে একদিন বাবার কাছে বেশ বিপদে পড়েন। সেদিন এক ভিখারী এসেছে বাড়ীতে। নানা সাহেবের স্ত্রী তাকে অনেক খাদ্যশস্য দিয়েছেনও। কিন্তু সে আরও চায়,—নাছোড়বান্দা। আরও কিছু দিন, বলে সে দাবী জানাতে থাকে, বলে – আরও না দিলে সে সেখান থেকে এক পাও নড়বে না।

নানা সাহেব ভিখারীর এ জিদ সহ্য করতে পারলেন না, তিনি তার পিওনের হাত দিয়ে ভিখারীটিকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

অন্তর্যামী সাইবাবার কাছে ঘটনাটা অজানা থাকেনি। এরপর নানা সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেই তিনি বেশ রুষ্টস্বরে তাঁকে বললেন, শোন, নানা, আমার উপদেশ মেনে যদি তোমার চলবার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আমার কাছে আসার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। এক দরিদ্র ভিখারী নিতান্ত দায়ে পড়েই তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার শরণ নিয়েছিল। পিওন ডেকে তাকে এমন অপমান করে তাড়ানোর প্রয়োজন ছিল না। তোমার সরকারী চাকরির আস্ফালন তাকে এমন করে না দেখালেই কি চলতো না? তুমি ভদ্রভাবে চুপ করে থাকলেই ত পারতে। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে আর কিছু পাবার আশা নাই বুঝে আপনা থেকেই চলে যেত।

নিজের ত্রুটির কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হয়ে নানাসাহেব বাবার করুণাঘন মূর্তির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, দুই চোখে তাঁর জল এসে গেল, বুঝলেন অন্তর্যামী বাবা দূরে থেকেও তাঁর দিকে দৃষ্টি

রেখে তাঁর দোষত্রুটি সব সংশোধন করে নিতে চান। তাঁর কৃপা এবং নিজের সৌভাগ্যের তুলনা নেই।

* • •

দুশ্চিকিৎস্য রোগাক্রান্ত কত রোগীকে যে বাবা তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে নিরাময় করেছেন তার লেখাজোখা নেই। দুই একটির কথা শুধু এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে—

ভীমাজী প্যাটেল পুনা জেলার জুন্নের-গ্রামের অধিবাসী। নিদারুণ যক্ষ্মা-রোগ এবং অগ্নিমান্দ্যে তাঁর মরমর অবস্থা। নিজের শক্তিতে এক পা চলবার ক্ষমতা নেই তাঁর। বড় বড় ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া ছাড়া দৈব ঔষধ, পূজা, মানৎ কোন কিছুই বাদ যায় নি, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয় নি। অবশেষে—

সাইবাবার মসজিদের সামনে একদিন এক টাঙ্গা এসে থামল, তাতে প্যাটেলজী। মৃতকল্প রোগীকে ধরাধরি করে নামানো হ'ল।

তাঁকে দেখামাত্র বাবার হুঙ্কার: ওরে এ হতভাগাকে আবার কে এখানে টেনে আনলে? আমায় আবার এ কি দায়িত্বের মাঝে ফেললে।

ভীমাজী প্যাটেল ধুঁকতে ধুঁকতে বাবার আসনের কাছে এসে তাঁর পায়ে মাথা রেখে থেমে থেমে বললেন, বাবা, আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আমার মত দুর্ভাগাকে একটু চরণে আশ্রয় দিন, কৃপা করুন আমায়।

রোগীর মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার গলার স্বর এবং মুখের ভাব পাল্‌টে গেল: আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, দুশ্চিন্তা ছেড়ে এবার চুপ করে বসো ত! শিরদিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট ভোগ তোমার কেটে গেছে। ভগবান এবার তোমার দুর্গতি মোচন করবেন।

এই বলে তাঁর সামনের ধুনী থেকে কিছুটা উধি নিয়ে তাঁর মাথায় মাখিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে

দেখলে ম্লানদেহ মৃতকল্প রোগী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, রোগের গ্লানি সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেকটা কমে গেছে।

ভীমাজী সেদিন রাত্রে এক অত্যদ্ভুত স্বপ্ন দেখে শিউরে উঠলেন। ভীমকায় এক পুরুষ এক ভারী মুগুর হাতে তাঁর বুকের উপর চড়ে বসে তাই দিয়ে তাঁর ব্যাধিজীর্ণ দেহটি যেন একেবারে ভেঙে-চুরে দিয়ে গেল।

পরের দিনই ভীমাজীর ব্যাধির উপসর্গ অনেক কমে গেল। তার পর অল্প কয়েকদিনের মাঝেই তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

* * * *

বাবা অনেক সময় রোগীর মারাত্মক রোগ নিজের দেহে টেনে নিয়ে রোগীকে রোগমুক্ত করতেন।

শিরদি অঞ্চলে সেবার খুব প্লেগ দেখা দিয়েছে। বাবার পরম ভক্ত জি, এস থাপার্দে তখন সপরিবারে বাবাকে দর্শন করতে এসেছেন। প্লেগে আক্রান্ত হ'লে কেউ আর বড় বাঁচে না, তাই স্থানীয় লোকের আতঙ্কের অবধি নেই। এমন দুর্দৈব-শিরদিতে আসার পর রাত্রে থাপার্দের পুত্র বলবন্তের প্রবল জ্বর দেখা দিল। দেহের গ্রন্থিগুলি সব স্ফীত হয়ে উঠল, বলবন্ত যন্ত্রনায় প্রায় অচেতন।

রাত্রি ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে থাপার্দের স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে বাবার কাছে ছুটে এসে পুত্রের মারাত্মক রোগের কথা শুনিয়ে বললেন, বাবা, আপনার আশ্রয়ে ক'দিন থাকব বলে এসেছিলাম, কিন্তু পুত্রের এই অবস্থা, এতে তাকে শহরে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, সুতরাং আমরা এখনই শিরদি থেকে চলে যেতে চাই, আপনি অনুমতি দিন।

মহিলার কথা শুনে বাবা প্রথমে কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপচাপ বসে রইলেন, তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ধীর কণ্ঠে রহস্যময় ভঙ্গীতে বললেন, কালো মেঘ জমেছে আকাশে, এরপর হবে বৃষ্টি। ফসল

ফলবে ক্ষেতে, তারপর তা তোলা হবে। আকাশ থেকে মেঘ হবে তখন উধাও। এত ভয় পাচ্ছ কেন তোমরা ?

বাবা আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু মায়ের মন এতে শান্ত হতে চায় না, অথচ সাইবাবাকে অমান্য করে যাওয়ার সাহসও নেই। অগত্যা তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করেই থাপার্দে-গৃহিণী শিরদিতেই রয়ে গেলেন।

দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগল। দুপুরে বাবা শ্রীমতী থাপার্দেকে কাছে ডেকে এনে—মায়ের কাছে শিশুর যেমন কোন লজ্জা থাকে না—তেমনি স্বচ্ছন্দে, তেমনি অবলীলায় নিজের কুঁচকীর স্থান দেখালেন: দুটি কুঁচকীই দস্তুর মত ফুলে উঠেছে, বলবন্তের মা বাবার গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন—গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

মহাপুরুষের মুখে কিন্তু হাসি: দ্যাখো, মা, তোমাদের জন্য এ দেহে কত কি টেনে আনতে হয়।

এদিকে সেই দিনই বলবন্তের মারাত্মক রোগ প্রশমিত হয়, দুই একদিনের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

কারোই বুঝতে বাকী রইল না কৃপাময় সাইবাবা ঐ মারাত্মক রোগ নিজের দেহে টেনে এনে থাপার্দের পুত্রটিকে বাঁচিয়ে দিলেন।

• • • •

বাইবেলে পাওয়া যায় প্রভু যীশুখৃষ্ট অন্ধকে দৃষ্টিদান করেছিলেন। শিরদির সাইবাবাও এমনি অন্ধকে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারতেন।

১৯১৬ সালের কথা। বাবার ভক্ত বিঠ্‌ঠল রাও কেশপাণ্ডে তাঁর বৃদ্ধ পিতামহকে নিয়ে এসেছেন শিরদির মসজিদে। পিতামহ একেবারে অন্ধ। দীর্ঘদিন বিশিষ্ট সুচিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে, কিছুতেই কোন ফল হয়নি।

সাইবাবার উপর তাঁর অলৌকিক শক্তির উপর বিঠ্‌ঠল

রাওয়ের অগাধ বিশ্বাস তাই—পিতামহকে তিনি সঙ্গে করে এনেছেন : বাবার কৃপা হ'লে এ অন্ধত্ব দূর হতে পারে। অন্য কোন উপায় নেই, আর সব চেষ্টা ত করেই দেখা হ'ল।

মসজিদে এসে বিঠ্‌ঠল রাও এবং তার ঠাকুরদা বাবার চরণ ধরে অনেক কাকুতি মিনতি, কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, বাবা বৃদ্ধকালে দৃষ্টি হারিয়ে বড় কষ্টে আছি,—এ কষ্ট কেউই দূর করতে পারলে না, আপনি কৃপা করুন, বাবা।

বৃদ্ধের কাকুতি মিনতি শুনে বাবার মন গলে গেল, বিঠ্‌ঠলকে সামনের ধুনী দেখিয়ে বললেন, ওখান থেকে কিছু উধি নিয়ে তোমার দাদুর দুই চোখে ঘষে দাও, ঠিক দেখতে পাবে।

বাবার কথায় ঐ উধি চোখে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, বাবা, আপনার শক্তি, আপনার করুণার সীমা নেই, আমি দুই চোখেই যে বেশ দেখতে পাচ্ছি! সেরে গেছে আমার অন্ধত্ব।

বৃদ্ধের মুখে এই কথা শোনামাত্র মহাশক্তিধর কৃপালু সাইবাবার জয়ধ্বনিতে মসজিদপ্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠল।

* * *

দূরে থেকেই সাইবাবা তাঁর ভক্তদের সংকটত্রাণ করতেন। শিরদি থেকে পুণা একশো মাইল দূরে। বাবার ভক্ত নানা-সাহেব পুণার কাছে টাঙ্গা করে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় টাঙ্গার ঘোড়াটা হঠাৎ কেমন ক্ষেপে যাওয়ায় বা বদমায়েসি করায় টাঙ্গাটা উল্টে গেল। এই সময় শিরদির মসজিদে বসে সাইবাবা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন, হায়, হায়, নানার বুঝি প্রাণ যায়, আমি তাকে মরতে দেব না।

এদিকে পুনার রাস্তায় নানা সাহেব এবং তাঁর সহযাত্রীরা গাড়ি থেকে ছিটকে দূরে পড়ে গেলেন, দেহে তাঁদের বিশেষ কোন আঘাত লাগল না।

এরপর নানা সাহেব শিরদিতে বাবার চরণ দর্শনে এলে তাঁর

ভক্তেরা তাঁকে সেদিনকার কথা খুলে বললে। নানা সাহেবের বুঝতে বাকি রহিল না—সেদিনকার দুর্ঘটনায় একমাত্র বাবার কৃপাতেই তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়েছে।

• • •

সাইবাবা তাঁর ভক্তদের বলতেন, তোমার বোঝা আমার উপর ছেড়ে দাও, তোমার ভার আমিই মাথায় করে বইব।

ব্যবসাদার শ্রীদামোদর ভাসানি বাবার বিশেষ অনুরাগী ভক্ত, বাবাকে না জিজ্ঞাসা করে তিনি কোন কিছুই করতেন না। বোম্বাই-এর এক ব্যবসাদার একদিন ভাসানিকে বললেন, ডাল কলাই-এর দর প্রতিদিন চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে, এস, এক সঙ্গে কিছু বেশি টাকার জিনিষ কিনে রাখি, প্রচুর লাভ হবে।

শ্রীভাসানি বাবার মত জিজ্ঞাসা করলে বাবা তাঁকে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন। বাবার কথার তিনি এ কাজ করলেন না বটে, কিন্তু মনটা তাঁর খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল: বাবা তাঁকে প্রত্যক্ষ লাভের ব্যবসা করতে দিলেন না।

কেন দিলেন না তা বুঝতে অবশ্য ভাসানির দেরী করতে হয় নি: অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ডাল কলাইয়ের দাম অপ্রত্যাশিত-ভাবে নেমে যাচ্ছে। দামোদর সাহেবের এবার বুঝতে বাকী রইল না—কেন বাবা তাকে ডালকলাই কিনে মজুত করতে নিষেধ করে-ছিলেন।

° ° °

যোগীদের নির্বিকল্প সমাধি বা গভীর সমাধির অবস্থায় জীবনের কোন লক্ষণই থাকে না। সাইবাবারও এই অবস্থা হ'ত।

শিরদির গ্রামে ঢুকবার পথেই পড়ে শ্রীখাণ্ডবাদেবের মন্দির। ১৮৮৬ সালে এই মন্দিরের পুরোহিত মহামানপতিকে একদিন বাবা বললেন, আমি ভগবানের কাছে যাচ্ছি। তিন দিন পর্যন্ত আমার এই দেহ তুমি রক্ষা করবে। যদি ফিরে আসি তা হ'লে আমিই

এর যত্ন নেব, আর যদি না ফিরি তবে তিন দিন পর তুমি এ দেহ সমাধিস্থ করবে।

এই কথা বলার পর দেখতে না দেখতে বাবার দেহ নিস্পন্দ অসাড় হয়ে গেল, জীবনের ক্ষীণ আভাসও তাতে রইল না। গ্রামের পুলিশ এসে পুরোহিতকে বাবার দেহ কবর দেওয়ার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করতে লাগল, মহালসাপতি তা শুনলেন না। তিনি মহাসতর্কতার সঙ্গে তিনদিন বাবার দেহটি পাহারা দিলেন। তৃতীয় দিন তাঁর নিঃস্পন্দ দেহে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস বইতে শুরু করল। সাইবাবা চোখ মেলে চাইলেন।

সত্য সাইবাবা

★ ★ ★ ★ ★ ★

সত্য সাইবাবা অর্থাৎ পুত্তাপর্তির সত্য নারায়ণ সাইবাবা—তাঁর ভক্তদের মতে—শিরদির সাইবাবারই অবতার। শিরদির আপ্তকাম সাইবাবাই তাঁর প্রাক্তনজন্ম সিদ্ধি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন সত্য-সাইবাবা রূপে। এরূপ ধারণার কারণও অতি স্পষ্ট। শিরদির বাবা তাঁর ধুনীর উধি অর্থাৎ ছাই দিয়ে যেমন রোগ নিরাময় ইত্যাদি অনেক অলৌকিক কার্য সাধন করতেন, ইনিও তাই করেন—তবে আরও অনেক বেশি। তবে এই উধি বা বিভূতি লাভের পন্থায় দু'জনের কিছু পার্থক্য আছে। শিরদির বাবা সর্বজন সমক্ষে তাঁর ধুনীতে জ্বালা কাঠেও ভস্মই ব্যবহার করতেন, আর সত্য সাইবাবা কেবলমাত্র বৃত্তাকারে হস্ত সঞ্চালন করে কোন অদৃশ্য লোক থেকে এই উধি সংগ্রহ করেন, কেউ তা বলতে পারে না, অনেক চেষ্টা করেও কেউ তার হদিশ পায় না। আর শুধু উধি বলেই নয়, শূন্যমার্গ থেকে যা কিছু তিনি উপস্থাপিত করতে চান—কোন মহাশক্তি বা যোগৈশ্বর্য বলে তাই তাঁর হাতে এসে যায়। হাত উপুড় করে

চক্রাকারে তিনি কয়েকবার ঘুরান, তারপর সে হাত চিৎ করে ধরলেই দেখা যায় তাঁর কাম্য জিনিস তাঁর হাতে এসে গেছে।

• • • •

সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে হাওয়ার্ড মারফেট নামে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী আইরিসকে নিয়ে এলেন ভারতবর্ষে এখানকার আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধানে। ঘুরলেন এখানকার—তীর্থে তীর্থে, পাহাড়-পর্বতে যোগৈশ্বর্যশালী সিদ্ধ মহাপুরুষের সন্ধানে। অনেক সাধু সন্তের দেখা পেলেন তাঁরা, কিন্তু যেমনটি তাঁরা চান তেমনটিই দেখা আর তাদের মেলে না।

এই সময় হঠাৎ একদিন এক পরিব্রাজক যোগীর কাছে সত্য সাইবাবার কথা শুনলেন মারফেট। যোগী সাইবাবার ভূয়সী প্রশংসা করে বললেন, অসাধারণ, অবিশ্বাস্য রকমের সিদ্ধি অর্থাৎ যোগৈশ্বর্যের অধিকারী তিনি।

কোথায় থাকেন এই সাইবাবা?

পুত্তাপর্তি নামে এক গ্রামে তাঁর আশ্রয়।

কি করে সেখানে যেতে হয়?

উত্তরে যোগী পথ এবং বাহনের যে বিবরণ দিলেন তাতে মারফেটের সাইবাবাকে দেখার ইচ্ছা তখনকার মত দমন করতে হ'ল। উত্তর ভারত ভ্রমণ করে এসে স্বামী স্ত্রী দুইজনই তখন ক্লান্ত। নিরিবিলিতে কিছুকাল বিশ্রাম নেবার জন্য মাদ্রাজের থিওসফিক্যাল হেড্‌কোয়ার্টার্সে রয়ে গেলেন তারা।

কিছুকাল পর গৈরিক-বসন-পরা এক তরুণী সন্ন্যাসিনী এলেন ওখানে। সন্ন্যাসিনী মার্কিন-মহিলা, হলিউড থেকে ভারতে এসে হৃষীকেষে স্বামী শিবানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন তিনি! নাম হয়েছে তাঁর নির্মলানন্দ। পূর্বগুরু শিবানন্দের দেহ রক্ষার পর এখন সাইবাবার শিষ্যা তিনি। মারফেট দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি পুত্তাপর্তিতে তাঁর নতুন গুরু সাইবাবার

যে অলৌকিক কার্যাবলী দেখেছেন সে সব পরমোৎসাহে শুনালেন মারফেট দম্পতিকে। মারফেট তাঁর-ই মুখে শুনলেন—বাবা এখন মাদ্রাজে এসেছেন, সঙ্গে কয়েকজন শিষ্য, তিনি তাদের একজন।

যাঁকে দেখবার জন্য বিপুল আগ্রহ রয়েছে মনে তাঁকে বিনা চেষ্টায় দেখবার এমন সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল জীবনে—ভেবে মারফেটের আনন্দের সীমা রইল না। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবার জন্য নির্মলানন্দকে বললে তিনি সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। স্ত্রী আইরিসের শরীরটা সেদিন ভাল ছিল না, তাঁকে সঙ্গে নেওয়া আর সম্ভব হল না বাবাকে দর্শন করাতে। নির্মলানন্দ তাই শুধু মারফেটকেই নিয়ে চললেন।

সাইবাবা মাদ্রাজে উঠেছিলেন তাঁরই এক ভক্ত ওখানকার এক ধনী অভ্রব্যবসায়ী সি· জি· বেঙ্কেটেশ্বরের বাড়িতে। বেশ সুন্দর বড় বাড়ি, সামনে লন আছে, ফুলবাগান আছে। বাবার দর্শনপ্রার্থী বহুলোক সেখানে পা আড়াআড়ি করে বসে আছে। নির্মলানন্দ মারফেটকে তাদের ভিতর দিয়ে বাড়ির সামনের বারান্দায় নিয়ে এসে বাবার এক মার্কিন ভক্ত বব রেমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁকেই দর্শনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানিয়ে কি কাজে অন্যত্র চলে গেলেন।

রেমার মারফেটকে বললেন, বাবার আজকের 'ইনটারভ্যু' বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে, দেখি কি করা যায়—এই বলে রেমার মারফেটকে ছোট্ট একটা বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। সেখানে দুইজন ভারতীয় দাঁড়িয়ে হয়ত বাবারই প্রতীক্ষা করছিলেন। মারফেটও তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পরে বাড়ির ভিতরকার দরজা খুলে এমন একটা লোক সেখানে এসে হাজির হ'লেন যে তেমন কাউকে মারফেট জীবনে দেখেন নি। দিব্বি ছোট খাটো চেহারা, লাল রঙের রেশমী আলখাল্লায় কাঁধ থেকে

গায়ের উপর পর্যন্ত ঢাকা, মাথায় ফুলো বাবরি চুল, হাল্কা বাদামী গায়ের রঙ, গোঁফ-দাড়ি কামানো মুখখানা থেকে যেন তাঁর ভিতরকার এক দিব্য আনন্দ উপচে পড়ছে। মারফেট সাইবাবার ছবি দেখেন নি কোনদিন তবু বুঝতে বাকী রইল না—যে ইনিই তিনি।

অমায়িক হাসি মুখে বাবা দ্রুত মারফেটের দিকে এগিয়ে এসে বলেন আপনিই অষ্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন ?

আজ্ঞে—হ্যাঁ।

এরপরই বাবা ভারতীয় দুইজনের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ তেলেগু ভাষায় কথা বলে তিনি তাঁর হাতটা উপুড় করে তরঙ্গ ভঙ্গীতে চক্রাকারে কয়েকবার ঘুরালেন—তারপর সেটা চিৎ করে সামনে মেলে ধরলেই দেখা গেল তাতে রয়েছে বেশ কিছুটা ভস্ম। বাবা ঐ ভস্ম দুইজন ভারতীয়ের মাঝে ভাগ করে দিলেন। এ পেয়ে ওদের একজন আবেগে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু করে দিলেন। বাবা তাঁর কাঁধ পিঠ চাপড়ে মায়ের মতন স্নেহে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। মারফেট পরে শুনলেন বাবা ঐ লোকটি ছেলের কঠিন রোগ নিরাময় করে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

এরপর মারফেটের পালা। সাইবাবা এবার মারফেটের দিকে ফিরে আবার সেই আগের মত তাঁর উপুড় হাত চক্রাকারে আবর্তন করতে লাগলেন। এবার কিন্তু তিনি তাঁর জামার আস্তানা তাঁর হাতের কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়েছেন। এ করলেন কেন তিনি—মারফেট পরে বুঝলেন। তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল বাবা হয়ত দক্ষ যাদুকরের মত তাঁর জামার হাতার কোন গোপন জায়গা থেকে ঐ ভস্ম বের করেন। বাবা তাঁর মনের কথাটি জানতে পেরেই এই কার্যটি করেছেন। যাই হক বাবা হাত ঘুরানোর পর তা চিৎ করলেই তাতে আবার আগেকার মত মিহি ভস্ম দেখা গেল। বাবা তা মারফেটের হাতে তুলে দিলেন। মারফেট ঐ ভস্ম নিয়ে কি করবেন ভাবছেন এমন সময় তাঁর বাঁ পাশ থেকে কে বলে উঠলেন, খেয়ে ফেলুন, এতে

আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে। শুনে তাকিয়ে দেখেন বব্‌-রেমার কোন ফাঁকে তাঁর বাঁ পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

মারফেট ভস্ম খাওয়ার কথা কোনদিন ভাবতেও পারেন নি, কিন্তু খেয়ে দেখলেন—এ ভস্ম খেতে বেশ ভালই, তা ছাড়া দিব্বি সৌরভ আছে এতে। এরপর তিনি বাবার দিকে চেয়ে বললেন, এর কিছুটা আমি আমার স্ত্রীর জন্য নিয়ে যেতে পারি কি—শরীরটা তাঁর তেমন ভাল নেই।

কাল তাঁকে এখানে নিয়ে আসবেন, বিকেল পাঁচটায়—বলেই বাবা সেখান থেকে সরে পড়লেন।

পরদিন বিকেলে স্ত্রী আইরিসকে নিয়ে মারফেট বাবার ওখানে যাচ্ছিলেন, বাবা যে বাড়িতে আছেন সেখানে ঢুকতে গিয়েই গ্যাব্রিয়ালা স্টিয়ার নামে এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় হ'ল তাঁদের। মহিলা সুইজারল্যাণ্ডের লোক, পুত্তাপর্তি থেকে বাবার সঙ্গেই এসেছেন এখানে। বড় অমায়িক ব্যবহার। তিনি মারফেট দম্পতিকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বসিয়ে বাবার পুত্তাপর্তিতে অনেক অলৌকিক লীলার গল্প শুনাতে লাগলেন। গল্প শুনতে শুনতে মারফেট হঠাৎ তাঁর নোটবইটা বের করে মহিলাকে বললেন, ওখানে যেতে হ'লে কোন পথে কি করে যেতে হয় একটু বিশদ করে বলুন ত—আমি টুকে নি। ঠিক এই সময় রেমার তাঁর স্ত্রী মারফেলকে নিয়ে হাজির হলেন সেখানে, মারফেটের ঠিকানা লেখা আর হ'ল না, বরং ওখান থেকে উঠে বাবাকে দেখবার জন্যে অন্য জায়গায় গিয়ে বসতে হ'ল।

একটু পরেই সাইবাবা ওখানে ঢুকতে গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েই মারফেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, আপনার স্ত্রীকে এনেছেন?

এরপর মারফেট দম্পতিকে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাবা আইরিসের সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন।

এই আলোচনা কালে দেখা গেল আইরিসের কোথায় কি গোলযোগ এবং তার কারণই বা কি তা সবই বাবার জানা। আইরিসকে তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়ে তার রোগ নিরাময়ের জন্যে হস্ত আবর্তনে শূন্য থেকে কিছু ভস্ম সংগ্রহ করে তাঁকে খেতে দিলেন।

মারফেট তাকিয়ে ছিলেন বাবার হাতের দিকে। তাঁর মনে তখনও সন্দেহ রয়ে গেছে, ভাবছেন এ কোন নিপুণ হাতের কোন ম্যাজিকের খেল কি না। বাবা এবার তাঁর দিকে ফিরে আস্তিনটা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে হাত উপুড় করে ঘুরালেন, মারফেট ভাবছিলেন ওটা চিং করে মেলে ধরলে তিনি আবার ওতে আগেকার মত ভস্মই দেখতে পাবেন। কিন্তু তা আর হ'ল না, বাবা যখন তাঁর হাতটা চিং করে মেলে ধরলেন তখন মারফেট দেখলেন তাতে রয়েছে বাবার মুখের ছোট্ট একটা ফোটোগ্রাফ আর নীচে লেখা তাঁর আশ্রমের পুরো ঠিকানা। ফোটোটা দেখলে মনে হয় সবেমাত্র ওটা লেবোরেটরী থেকে ধোয়া হয়ে এল। ঠিকানা সমেত ফোটোটা মারফেটের হাতে দিয়ে বললেন, ধরুন, আপনি আমার ঠিকানা চাইছিলেন।

মারফেট ত অবাক্, কি করে জানলেন ইনি যে আমি ওঁর ঠিকানা জানতে চাইলাম। কোন রকমে আমতা আমতা করে বললেন, আমি—মানে আমরা কোনদিন আপনার ওখানে আসতে পারি কি?

নিশ্চয়, যখন খুশি, সে ত আপনাদের নিজেরই বাড়ি।

° ° ° °

মি. মারফেট পুত্তাপর্তিতে এসেছেন, বাবার আশ্রমে। এখানে আসার পর প্রথমে পরিচয় হ'ল তাঁর মি. এন. কস্তুরী বলে বাবার এক ভক্তের সঙ্গে। মি. কস্তুরী আগে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন, তাছাড়া ছিলেন মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। তিনি এখন বাবার আশ্রমের সেক্রেটারী। ছোট্ট কিন্তু দিব্বি সাজানো গোছানো

একটা গেস্ট হাউসে মারফেটের থাকার ব্যবস্থা হল,—খাবেন তিনি আশ্রমেরই ক্যান্টিন থেকে। থাকা খাওয়ার জন্য কোন খরচ দিতে হবে না তাঁর, কারণ তিনি এখন বাবার অতিথি।

মি· কস্তুরির মুখে এ কথা শুনে মারফেট বললেন, বেশ, তা হ'লে যাবার সময় কিছু প্রণামী দিয়ে যাব।

শুনে মি· কস্তুরি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, সেটি হবার জো নেই, বাবা কোন ডোনেশান নেন না।

তা হ'লে, তা—হ'লে আশ্রম পরিচালনায় বাবার ধনী ভক্ত শিষ্যেরা বোধ হয়—

না, বাবা কারো কাছ থেকে কোন আর্থিক সাহায্য নেন না।

শুনে আশ্চর্য হয়েছেন মারফেট ঃ নইলে আশ্রম চলে কি করে? পরে আরও অনেকের কাছে এই কথা শুনে তাঁর মনে হয়েছে যে অলৌকিক শক্তি বলে শূন্য থেকে তিনি নানা জিনিস সংগ্রহ করেন, অর্থ সংগ্রহও হয়ত তাঁর সেই শক্তিবলেই হয়।

মারফেট মি, কস্তুরির কাছে শুনলেন—বাবা সাক্ষাৎকারের জন্য শীগগিরই তাঁকে ডেকে পাঠাবেন—এখন তিনি বড় ব্যস্ত। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পরে হলেও কোন দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বাবার দর্শনলাভের সুযোগ কয়েকবার তিনি পেয়েছেন।

এসব সাক্ষাৎকারে মারফেট দেখেছেন—বাবা প্রথমে তাঁর দর্শনার্থী ভক্তদলের কিছু ধর্ম-উপদেশ দেন, কারো কোন ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলে তাঁকে নিরালা ঘরে ডেকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। আর প্রতি সাক্ষাৎকারেই তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে শূন্য থেকে শুধু ভস্ম আনেন না, পেনড্যাণ্ট, হার, অঙ্গুরী, নেকলেস ইত্যাদি এনে বিভিন্ন ভক্তকে তাই দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

মারফেটের মনের সন্দেহ পুরো যায় নি দেখে তাঁর সামনে তিনি জামার আস্তিনটা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে নেন। মারফেটের মনের কথা

বুঝতে পেরেই একবার তিনি মারফেটের একেবারে কাছের চেয়ারে হাতলে তিনি তাঁর ডান হাতটা চিৎ করে খুলে রাখলেন, একটু পরে সেটা তুলে উপুড় করে চক্রাকারে ঘুরাতে লাগলেন। প্রথম সেটা খালিই ছিল, কিন্তু একটু পরেই মারফেট দেখলেন বাবার হাতের মুঠোর ভেতর থেকে কি একটা চক্‌চকে জিনিষ উঁকি মারছে। এরপর তিনি হাত খুললে তার মাঝ থেকে বেরুল একশো আটটা রঙিন পাথরে গাঁথা একটা জপমালা। বাবার বাঁ দিকে এক বৃদ্ধা মহিলা বসে ছিলেন, জপমালাটা বাবা সেই মহিলার গলায় পরিয়ে দিলেন। আবেগে মহিলা কেমনই যেন হয়ে গেলেন, দুই চোখ তাঁর জলে ভরে এল, নতজানু হয়ে তিনি তখনই বাবার চরণে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

কয়েক দিন পরেই শিবরাত্রি। ভক্ত শিষ্যে আশ্রম সরগরম। আশ্রমের সাতশো স্থায়ী বাসিন্দা তো রয়েছেই, তা ছাড়া প্রতিদিনই দলে দলে লোক আসছে ভারতের নানা প্রদেশ, নানা অঞ্চল থেকে। মারফেটের যার সঙ্গেই পরিচয় হয়, কথা হয় তার কাছেই শোনেন বাবার অলৌকিক যোগৈশ্বর্যের কাহিনী, কারো নিজের, কারো আপন-জনের রোগ সারিয়েছেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন বাবা—তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার বলে।

০ ০ ০ ০

আশ্রমে একটা হাসপাতাল আছে। এর সুপারইনটেণ্ডেণ্ট হচ্ছেন ডক্টর সীতারামিয়া। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর বাবার অনুরোধে তাঁকে এর ভার নিতে হয়েছে। এ ভার তিনি নিতে চাননি, বাবা বলেছেন, আপনাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না, দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা যা করবার তা আমিই করব, আপনি যেটুকু পারেন রোগীদের একটু দেখাশুনা করবেন। বাবার ভক্ত ডঃ সীতারামিয়া এরপর আর 'না' বলতে পারেন নি।

বাবার অলৌকিক চিকিৎসার কাহিনী ডঃ সীতারামিয়া মিঃ

মারফেটিকে অনেক শুনিয়েছেন। দুই একটা এখানে বিবৃত করা গেল। হাসপাতালে একবার এক মহিলা ভক্ত এলেন ব্যাঙ্গালোর থেকে। কঠিন টি. বি-তে ভুগছেন তিনি, কাশিতে রক্ত, এক্সরেতে পাওয়া গেছে ডান বুকটায় গর্ত হয়ে গেছে। ডাক্তাররা বলেছেন ঠিক মত চিকিৎসা চালালে রোগ সারতে পারে, কিন্তু দু'বৎসর সময় লাগবে। ঐসব ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন না থেকে মহিলা সোজা চলে এলেন বাবার আশ্রম প্রশান্তি নিলয়মে। তাঁকে হাসপাতালে রাখা হ'ল বটে কিন্তু অন্য কোন চিকিৎসা করা হল না, বাবা তাঁর হস্তাবর্তনে আনা বিভূতি খাইয়ে এক সপ্তাহে তাকে নিরাময় করে তুললেন। ডাক্তারদের দুই বৎসরের জায়গায় বাবার লাগল মাত্র এক হপ্তা।

° ° ° °

সুইজারল্যাণ্ড থেকে সদ্যপ্রত্যাগত বম্বের এক যুবক এলেন প্রশান্তি নিলয়মে, আভ্যন্তরীণ কঠিন রোগে ভুগছেন তিনি। ইউরোপের এবং বম্বের যে সব ডাক্তারদের কাছে গিয়েছেন তাঁরা সবাই বলেছেন — রোগটা হচ্ছে তাঁর ক্যানসার। যুবক সাইবাবার ভক্ত শিষ্য কিছু নয়, এক বন্ধুর পরামর্শে তিনি প্রশান্তি নিলয়মে এসেছেন। এসে হাসপাতালে উঠলেন এবং তিনি রইলেন ক্যানটিনের কাছাকাছি একটা ঘরে। সেখান থেকেই মনে মনে তিনি বাবার কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকলেন।

একদিন রাত্রে তিনি যেন এক স্বপ্নের মাঝে দেখলেন কে একজন চক্চকে ছুরি হাতে তাঁর কাছে এলেন। ডঃ সীতারামিয়ার এবং আরও কয়েক জনের কাছে যুবক আবার এ কথাও বলেছেন আসলে এটা তার স্বপ্ন নয়, ক্যানটিনের ম্যানেজার সকালে তাঁর প্রাতরাশ নিয়ে এলে তিনি তাঁকে নিজের বিছানার চাদরে একটা রক্তের দাগ দেখিয়ে বলেছেন, আমার ঘুমন্ত অবস্থায় বাবা কি আমার দেহে অস্ত্রোপচার করে গেলেন নাকি? এ রকম ব্যাপার অবশ্য আগেও

অনেকবার ঘটেছে। যাই হ'ক ঐ রাত্রির পরে যুবকের দেহে ক্যানসারের যন্ত্রনা আর লক্ষণ কিছুই রইল না।

রোগ নিরাময়ের পর যুবক আবার সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে তাঁর কর্মে যোগদান করেন। বছর খানেক পরে ডঃ সীতারামিয়া যুবক কেমন আছেন জানতে চেয়ে তাঁর কাছে এক চিঠি লেখেন। উত্তরে যুবক জানিয়েছেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, রোগের কোন লক্ষণ আর তাঁর দেহে নেই, সেই সঙ্গে তাঁর কঠিন রোগ সারানোর জন্যে সাইবাবাকে জানিয়েছেন অসংখ্য প্রণামের সঙ্গে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

৫৮ বৎসরের এক বৃদ্ধকে হাসপাতালে আনা হল। Hypur pyrexiaতে ভুগছিলেন তিনি। এর আগে দুই মাস অন্য হাসপাতালে ছিলেন তিনি। সেখানকার চিকিৎসায় রোগের কোন উপশম হয়নি। আশ্রমের হাসপাতালে আসবার পর ওখানকার চিকিৎসকেরা তাকে কুইনাইন, পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিটিন ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করলেন, কিছুই হল না। টেম্পারেচার সব সময়েই ১০৩এর উপরে। বিকারে প্রলাপ বকেন, মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে যান। অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে, বাঁচবার কোন আশাই আর দেখা যায় না।

রোগীর এই অবস্থার কথা শুনে সাইবাবা হাসপাতালে এলেন তাঁকে দেখতে। বাবা তাঁর চিরাচরিত পন্থায় শূন্য থেকে ভস্ম এনে তার খানিকটা রোগীর কপালে লাগিয়ে দিলেন—তার অচেতন অবস্থাতেই। কিছুটা দিলেন তাকে খাইয়ে। এর একটু পরেই রোগীর টেম্পারেচার নামতে সুরু করল, চেতনা ফিরে এল। এরপর অতি দ্রুত তাঁর রোগমুক্তি ঘটতে লাগল। দুই একদিনের মধ্যে তিনি সম্পুর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। গায়ে সাবেক বল ফিরে এলেই তাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি করে দেওয়া হল।

° ° ° °

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক সম্পূর্ণ পঙ্গু এক প্রৌঢ়কে আশ্রমে আনা হ'ল। ভদ্রলোক মস্তর মত ধনী, মহীশূর রাজ্যে তার কফীর আবাদ আছে। গত বিশ বৎসর যাবৎ কঠিন 'আর্থরাইটিস' রোগে ভুগছেন তিনি। অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখানো হয়েছে, কেউই কিছু করতে পারেননি। গোড়ায় রোগের সঙ্গে আবার আর একটি যুক্ত হয়েছে: একটা কিডনি অথম হয়ে গেছে, একেবারে নিষ্ক্রিয়। টেম্পারেচার ১০৩ থেকে ১০৪ এর মধ্যে উঠানামা করে।

প্রশান্তি নিলয়মের হাসপাতালে এসে কোন ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে তিনি রাজী হলেন না, বললেন, আমি সাঁই বাবার আশ্রয়ে এসেছি, তিনিই যা হয় করবেন, তাঁর ঐশী শক্তিতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে।

এর চিকিৎসার ব্যাপারে সাইবাবা হস্ত সঞ্চালনে ভস্ম আনলেন না, আনলেন এক বোতল তরল ঔষধ। তারই দুই ফোঁটায় জল মিশিয়ে খেতে বললেন রোজ। দিন পনের পরই রোগী লাঠি ভর দিয়ে চলাফেরা করতে লাগলেন। ভজন ঘরের পাশ দিয়ে চলবার সময় বাবা তাঁকে একটি মন্ত্র দিলেন জপ করতে। মাসখানেকের মধ্যে তিনি লাঠি ছাড়াই চলতে পারলেন, তা ছাড়া এর মাঝে কিডনিটাও তার ঠিক হয়ে গেছে, এখন পুরো সক্রিয়।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে আবাসে ফিরে যাবার আগে তিনি যখন বাবাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাতে গেলেন, তখন বাবা বললেন, রোগ আপনার আমি সারাইনি, সারিয়েছে আপনার নিজের বিশ্বাস, ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য।

০ ০ •

১৯৬৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী। শিবরাত্রির দিন। অসংখ্য লোক এসেছে প্রশান্তি নিলয়মে। ঘরে বাইরে এতটুকু জায়গা খালি নেই। সকালে মন্দিরের সামনে জমেছে দারুণ ভীড়। বাবার দর্শনার্থী ভক্তেরা বাবাকে একবার দেখে জীবন ধন্য, দিনটা সার্থক করে তুলবে।

মারফেট ঐ ভিড়ের মধ্যে কোন রকমে একটু দাঁড়ানোর জায়গা করে নিয়েছেন। হঠাৎ দেখা গেল ভক্তদের দেখা দেবার জন্যে বাবা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, হাত তুলে জনতাকে আশীর্বাদ জনিয়ে তখনই আবার ভিতরে চলে গেলেন। দেখে মারফেটের মনে হ'ল বাবার অবস্থা যেন আজ স্বাভাবিক নয়। ঠিক এই সময় ডঃ সীতারামমিয়াকে পেলেন তিনি পাশে। বাবাকে দেখেই তিনি আসছেন। তাঁরই মুখে শুনলেন মারফেট বাবার টেম্পারেচার আজ ১০৪। সীতারামিয়া বললেন, ওঁর দেহের ভিতরে আজকের দিনে যে শিবলিঙ্গ গড়ে ওঠে—তারই জন্য এই উত্তাপ।

বাবার চোখে মুখে কিন্তু এজন্য কোন উদ্বেগের চিহ্ন নেই, যেন কিছুই হয়নি তাঁর, কিছুই হচ্ছে না—এই রকম ভাব।

বরাবরই এই দিনে উপস্থিত জনতা তার কিছু অলৌকিক লীলা দেখবার সুযোগ পায়। এবার পেলো ছুটোর। সকালে তার যে সিদ্ধাইয়ের ব্যাপার দেখা গেল সেটা হচ্ছে এই—

মস্ত বড় এই ছাউনীর নীচে হাজার হাজার লোক বসে আছে তাদের মাঝখানে এক মঞ্চ। সেই মঞ্চের উপরে বাঁধা হয়েছে রূপো দিয়ে তৈরী শিরদির সাইবাবার বেশ বড় রকমের এক মূর্তি। প্রথমে মি. কস্তুরি ফুট খানেক উঁচু একটা কাঠের ভস্মাধারে ভস্ম নিয়ে এসে শিরদির সাইবাবার মূর্তির উপরে ঢালতে লাগলেন। ঢালা শেষ হয়ে গেলে তিনি অল্প করে পাত্রটায় ঝাঁকি দিতে লাগলেন, নাড়া দিতে লাগলেন যাতে তাতে একটুও ভস্ম লেগে না থাকে। এরপর তিনি ওর খোলা মুখ নীচুর দিকে করে ওটা মূর্তির মাথার উপর ধরলেন।

এবার সাইবাবা সেই উপুড় করা শূন্য পাত্রের মধ্যে কনুই অবধি হাত ঢুকিয়ে—আগে মেয়েরা দুধ থেকে মাখন তোলার জন্য যেমন করতেন—ঠিক তেমনি করে হাত ঘোরাতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাত্র থেকে ভস্ম পড়তে লাগল—শিরদির সাইবাবার মূর্তির মস্তকে সর্বাঙ্গে। বাবা হাত ঘুরানো থামালেন, ভস্ম বর্ষণও থেমে গেল। এরপর বাঁ হাত

ঢুকিয়ে অমনি দধি মন্থনের মত ঘোরাতেই আবার ভস্মবৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। বাঁ হাতের পরে আবার ডান হাত, তারপর আবার বাঁ হাত —এমনি করে হাত পালটে পালটে ঘুরিয়ে শূন্য পাত্র থেকে ভস্ম বর্ষণ করিয়ে শিরদির সাইবাবার মূর্তিটিকে ভস্মস্নান করালেন।

দেখে উপস্থিত ভক্তদর্শকবৃন্দের চোখে মুখে আনন্দ, বিস্ময় আর ভক্তি উপচে পড়তে লাগল। মারফেটের কিন্তু তখন মনে হচ্ছে এতে এত বিস্ময়ের কি আছে, যিনি ইচ্ছা করলে শূন্যে হাত ঘুরিয়ে ভস্ম আমদানি করতে পারেন, একটা উপুড় করা খালি পাত্র থেকে তিনি ভস্ম বর্ষণ করবেন তাতে আর এমন অবাক্ হবার কি আছে?

ঠিক এই সময়ে শোনা গেল পাশের লোকজন সব বলাবলি করছে —আজকের আসল তাজ্জব ব্যাপার ত এ নয়, সে হচ্ছে—

কি?—জিজ্ঞাসা করে বসলেন মারফেট।

বাবা প্রতি বৎসর এই দিনে, এই শিবরাত্রির দিনে এক বা একাধিক শিবলিঙ্গ বের করেন নিজের দেহ থেকে—মুখ দিয়ে।

সন্দিগ্ধ মন মারফেটের, অত ভক্তের মাঝে বেকুবের মত বলে বসলেন, আপনারা ঠিক জানেন ত—স্টেজে আসবার আগে উনি মুখের মাঝে ওটা পূরে নিয়ে যথা সময়ে উদ্গীরণ করে দেখান না?

মারফেটের কথা শুনে সবাই যেন কেমন অনুকম্পার চোখে তাকাতে লাগলেন তাঁর দিকে। একজন আর উত্তর না দিয়ে থাকতে পারলেন না, বললেন, তা হবে কি করে, লিঙ্গ বের করবার আগে তিনি যে অনেকক্ষণ ধরে গান করেন—অনেক কথা বলেন, অতবড় একটা জিনিস মুখের মধ্যে রেখে কথা বলা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। গেল বৎসর শিবলিঙ্গটা এত বড় ছিল যে, মুখের মাঝে আঙুল দিয়ে টেনে বার করতে হ'ল, মুখের দু-পাশ কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

যা'ক এবারকার অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের এই তাজ্জব ব্যাপারটার কথায় আসা যাক। বাবার দেহ থেকে শিবলিঙ্গ নির্গমন ঘটল

সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যা ৬টায় বাবা কয়েকজন শিষ্য নিয়ে আশ্রমের শান্তিবেদিকায় এলেন। উৎসবের দিন বেদিকার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। বেদিকায় খুব জোরালো বিজলী, বাতি জ্বলছে। প্রথমে কয়েকজন ভক্ত পণ্ডিত বক্তৃতা দিলেন, এদের মাঝে একজন দিলেন বৈদিক উচ্চারণে সংস্কৃতে। প্রায় সাড়ে আটটায় সাইবাবা উঠে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি দিব্য মধুর কণ্ঠে একটা স্তব গান করলেন। তারপর তিনি তেলেগু ভাষায় নানা ধর্মকথা আলোচনা করলেন। নিছক ধর্মকথা পাছে শ্রোতাদের একঘেয়ে লাগে মনে করে মাঝে মাঝে তাঁকে কিছু রসিকতা করতেও দেখা গেল। এমনি করে আধঘণ্টা ভাষণ দেবার পর বাবার কণ্ঠস্বর যেন কেমন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। কথা বলতে চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি কিন্তু আগের মত সহজ কণ্ঠ আর তাঁর তখন নেই। এবারে কি হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে তার কয়েকজন ভক্ত তখন ভজন গান শুরু করে দিলেন, পরে আর সবাইও তাতে যোগ দিল।

বাবাকে দেখে মনে হল ভিতরে তাঁর যেন কি কষ্ট হচ্ছে। বসে পড়লেন তিনি, একটা ফ্লাস্ক থেকে কিছুটা জল পান করে নিলেন। এরপর তিনিও গান গাইতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পেরে উঠলেন না। এইবার তাঁর দেহের ভিতরে যেন সত্যিকার কষ্ট সুরু হল, দেহটা যেন দুমড়াচ্ছে। দুই হাতে থুতনিটা ধরলেন। তারপর মাথাটা নিচু করে আঙুল দিয়ে চুল টানতে লাগলেন। এরপর আর একবার জল খেয়ে নিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

বাবার যন্ত্রণা দেখে ভক্ত শিষ্যেরা আরও জোর ভজন গাইতে লাগলেন। বাবার কষ্ট পাওয়া সহ্য করতে না পেরে, কোন কোন ভক্ত আবার কাঁদতে সুরু করলেন। মেয়েদের প্রসব বেদনার মত একটা যন্ত্রণার ভাব বাবার সারা দেহে প্রকাশ পাচ্ছে, তাই নিয়েই তিনি হাসতে এবং গান গাইতে চেষ্টা করছেন। প্রায় বিশমিনিট এই অবস্থায় কাটবার পর হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে একটা সবুজ আলোর ঝলক

বেরিয়ে এল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরুল লিঙ্গ। বাবা প্রথমে সেটা দুই হাত পেতে ধরলেন, পরক্ষণে অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী দিয়ে ধরে তুলে সবার দেখবার সুযোগ করে দিলেন। দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল জনতা।

শিব লিঙ্গটার বর্ণ সবুজ এবং আকারে সেটা এত বড় যে সাধারণ কোন লোক তার গলা দিয়ে বের করতে পারবে না। দর্শকদের ভাল করে দেখবার সুযোগ দিতে বাবা সেটা একটা জোরালো টর্চের সামনে রাখলেন। স্বচ্ছ সবুজ পাথরের ভিতর দিয়ে আলো যাতায়াত করতে পারায় তা দিব্য সুন্দর দেখাতে লাগল।

পান্না পাথরের এই শিবলিঙ্গটির উচ্চতা তিন ইঞ্চি এবং যে বেদিটার উপর স্থাপিত সেটা আরও অনেক বড়। কয়েক দিন পরে স্পষ্ট দিবালোকে মারফেট ওটা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, দেখে বিস্মিত হয়েছেন। বাবা তখন তার পাশেই উপস্থিত ছিলেন, মারফেটকে বললেন, কোন কিছু যদি আপনাকে উপহার দিই আপনি হারিয়ে ফেলবেন না ত?

না, বাবা, আমি কিছুতেই হারাব না।

বাবা আস্তিন গুটিয়ে তখনই তাঁর চোখের সামনে শূন্যে কয়েকবার হাত ঘোরালেন, তারপর হাত যখন খুললেন, তখন দেখা গেল—তাতে রয়েছে সোনা রূপো দিয়ে তৈরী একটা অঙ্গুরী। অঙ্গুরীটা বাবা নিজেই মারফেটের আঙুলে পরিয়ে দিলেন, একেবারে ঠিক ঠিক লাগল। রূপোর মত অংশটার ব্যাখ্যা করতে বাবা মারফেটকে বললেন, এটা কিন্তু রূপো নয়—এর নাম পঞ্চ লোহা, মন্দিরের অনেক মূর্তি এই মিশ্র ধাতু দিয়ে তৈরী হয়।

অঙ্গুলীর স্বর্ণাংশের দিকে নজর পড়তে মারফেট কিন্তু অতিমাত্রায় বিস্মিত না হয়ে পারলেন না, তাতে রয়েছে শিরদির সাইবাবার মূর্তি। এই মহাপুরুষকে যে মারফেট মনে মনে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, ভক্তি করেন তা ত বলেননি তিনি কোনদিন বাবাকে, তা হ'লে বাবা তা

জানলেন কি করে ?

* * * *

অন্যান্য সাধুসন্তদের বেলায় দেখা যায় দীর্ঘকাল কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা বা যোগ সাধনার ফলে তাঁরা সিদ্ধাই, বিভূতি বা যোগৈশ্চর্য লাভ করেন। কিন্তু সত্য সাইবাবার বেলায় এ ব্যাপার একেবারে স্বতন্ত্র। যোগৈশ্বর্য যেন তাঁর সহজাত গুণ, এ যেন তাঁর প্রাক্তন সাধনার ফলশ্রুতি। ছেলেবেলার দু'একটি ঘটনাই এর প্রমাণ।

বাল্যকাল থেকেই সত্য নারায়ণের হৃদয় বড় কোমল, তিনি মাছ মাংস খেতে পারেন না, জীবহিংসা, জীবনির্যাতন দেখতে পারেন না। পথে ভিখারী ক্ষুধার্ত পশু কাউকে দেখলেই তাদের খাওয়ানোর জন্যে বাড়িতে ডেকে আনেন। বাড়িতে তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা না করতে পারলে, তিনি নিজেও না খেয়ে থাকেন, অনেক সময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ফিরে এলে মা ব্যাকুল হয়ে খাবার জন্যে সাধাসাধি করলে বলেন, আমি খেয়েছি ত, পায়েস, মালপো খেয়ে পেট আমার ভরে গেছে।

কে দিলে তোকে এত ভাল খাবার ?

কেন,—তাতা বুড়ো দিলে।

কে এই তাতা বুড়ো মা ত জানেনই না. এমন কি গাঁয়ের কোন লোকই তাকে কোন দিন দেখে নি, এমন কি নাম পর্যন্ত শোনে নি। মা ছেলের কথা বিশ্বাস করতে চান না, ছেলে তখন বললে, ছাখো, আমার হাত শুঁকে ছাখো। বলে ছেলে হাত বাড়িয়ে দিলে মায়ের নাকের কাছে। মা শুঁকে দেখলেন সত্যিই তাতে দুধ আর ঘিয়ের গন্ধ লেগে রয়েছে।

আট বৎসর বয়সে গ্রামে স্কুল ছেড়ে বুক্কাপুৎনামের উঁচু স্কুলে পড়তে গেছেন সত্য, তখনই তিনি তাঁর সঙ্গীদের গুরু হয়ে উঠেছেন। সত্য নারায়ণ স্কুলে বসবার অনেক আগেই স্কুলে গিয়ে হাজির হ'তেন, গিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে কোন ঠাকুরের মূর্তি বা ছবির পূজো করতেন।

যারা আসতে চাইত না তাদের আনবার জন্য তখনই তিনি একটা শূন্য থলি থেকে তাদের জন্য মেঠাই আর ফল বের করতেন। কোন ছেলে তার পেনসিল বা রাবার হারালে তিনি ঐ থলি থেকে বের করে দিতেন। কারো অসুখ হলে তার অসুখ সারানোর ওষুধও তিনি ঐ থলি থেকে বের করতেন।

কোথায় পাও তুমি এ সব, কে দেয়, জিজ্ঞাসা করত সঙ্গীরা।

আমার এক গ্রাম শক্তি আছে, সে আমার বড় অনুগত, তার কাছে আমি যা চাই তাই সে আমায় এনে দেয়।

সত্যনারায়ণের বাল্য সঙ্গীদের সরল মন, সহজেই বিশ্বাস করল অদৃশ্য বিদেহী কেউ তাঁর অনুগত, আজ্ঞাবহ। তারই সাহায্যে তিনি সব কিছু আমদানি করেন। তখন থেকেই সঙ্গীরা তাঁকে 'গুরু' বলে ডাকতে সুরু করল।

এর পর বাবা যখন উরবাকোণ্ডার হাইস্কুলে এলেন তখন তাঁর অলৌকিক শক্তির খ্যাতি তাঁর আগেই পৌঁছে গেছে। স্কুল সুরু হবার আগে যে প্রার্থনা সভা বসে তার ভজন বা স্তোত্র সঙ্গীতে তিনিই মূল গায়ক, তাঁর দিব্য মধুর উদাত্ত কণ্ঠ আর সবার কণ্ঠকে ছাড়িয়ে যায়। তাঁর ভক্তি ভাবোচ্ছাসে শুধু ছাত্রেরা নয়, শিক্ষকেরাও মোহিত, অভিভূত।

সত্যনারায়ণের বড় ভাই শেষামা ঐ স্কুলেরই একজন শিক্ষক।

এই স্কুলে পড়বার সময়ই অকস্মাৎ একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যার সঙ্গে তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল,—শুধু লোকসমাজে নয়, হয়ত তাঁর নিজের কাছেও। ঘটনাটা সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে—

১৯৪০ সালের ৮ই মার্চ। সত্যনারায়ণের বয়স তখন চোদ্দ চলেছে। সন্ধ্যা ৭টার সময় খালি পায়ে তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ডান পায়ের একটা আঙ্গুল ধরে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর আর্তনাদ শুনে আশেপাশের লোকজন সব ছুটে

এল। ঐ অঞ্চলে কালো এক রকম কাঁকড়া বিছের প্রাদুর্ভাব, সর্প-দংশনের মত তাদের কামড়েও লোক বড় বাঁচে না। আঁধারে কোন বিছে বা সাপ লোকের চোখে পড়ল না। সে রাত্রে সত্যর দেহে কোন রোগ বা যন্ত্রণার লক্ষণ দেখা গেল না, বেশ ভালভাবেই ঘুমালেন তিনি। দেখে সবার মনেই শান্তি। ২৪ ঘণ্টা পর পরদিন সন্ধ্যা ৭টায় কিন্তু তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। শরীর একেবারে কাঠ, নিঃশ্বাস ও হৃদস্পন্দন অতীব ক্ষীণ। বড় ভাই শেষামা এক ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তার একটা ইনজেকশান দিয়ে খাবার জন্য একটা মিক্‌শ্চার দিয়ে গেলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না, রাত্রে জ্ঞান তাঁর আর ফিরে এল না।

পরের দিন জ্ঞান ফিরে এল বটে, কিন্তু আগেকার সত্য যেন তিনি আর ন'ন। এ যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তার কোন জবাব দেন না, কোন কিছু খেতে দিলে খেতে চা'ন না। হঠাৎ কোন স্তোত্রগান গেয়ে ওঠেন, বা এমন সব সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে থাকেন ঐ বয়সে যা তাঁর জানবার কথা নয়। মাঝে মাঝে দেহ তাঁর এমন হয়ে উঠে যে দেখে মনে হয় এখনই বুঝি দেহ ছেড়ে তিনি কোথাও চলে যাবেন। কখনও দেহে তাঁর মত্তহস্তীর বল, কখনও তা তৃণের মত দুর্বল। এ ছাড়া কখনও অকারণ হাসছেন, কখনও কাঁদছেন, কখনও বেদান্তের দুর্বোধ্য সূত্র ব্যাখ্যা করছেন, কখনও আবার যে সব তীর্থে তিনি কোনদিন যান নি, সেই সব তীর্থের কথা বলছেন।

পুত্তাপর্তিতে খবর পাঠানো হ'লে সেখান থেকে সত্যের বাপ-মা এলেন। তাঁরা এসে অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখালেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। কেউ কেউ বললেন, সত্যের কোন বদ্ ভুতে ধরেছে, কেউ বললেন কোন দুষ্ট গুণী ওকে তুক করেছে। তাদের কথা মত রোজা ডাকা হ'ল, কিছুই করতে পারলেন না তারা।

শেষে সত্যের বাপ-মা তাঁকে কাদিরি নামে একটা জায়গায় এক

মহাশক্তিশ্বর তান্ত্রিকের কাছে নিয়ে এলেন। তান্ত্রিক সত্যকে নিয়ে তন্ত্রমতে নানা ক্রিয়া করলেন, তাঁর মাথা কামিয়ে, অস্ত্র দিয়ে তাতে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে তাতে লেবু, রসুন ইত্যাদির রস ঢেলে দিলেন। কিছুতেই কিছু হয় না, কোন যন্ত্রণার আওয়াজও সত্যের মুখ থেকে বেরোয় না। এতে রেগে গিয়ে তান্ত্রিক তাঁর এক মোক্ষম দাওয়াই 'কালিকম' সত্যর চোখে লাগিয়ে দিলেন। এতে যন্ত্রণায় সত্যর মুখ মাথা সব লাল হয়ে উঠল, চোখ সঙ্কুচিত হয়ে তা থেকে জল বেরুতে লাগল কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে।

তাঁর এ অবস্থা দেখে তাঁর মা বাবা দিদি কাঁদতে লাগলেন। তখন সত্য নিজেই একটা জিনিসের কথা বলে দিলেন। সেটা এনে চোখে লাগাতে তাঁর চোখের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হয়ে এল।

বাপ-মা তান্ত্রিকের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে সত্যকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এলেন। তখনও তাঁর অবস্থা আদৌ স্বাভাবিক নয়। তিনি লম্বা লম্বা সংস্কৃত স্তব আবৃত্তি করেন, বেদান্তের দুরূহ সূত্র ব্যাখ্যা করেন, কখনও বলেন, ঐ যে আকাশ পথে দেবতারা যাচ্ছেন তাঁদের আরতি করো।

বাড়িতে এনেও ডাক্তার দেখানো হ'ল, কিছুই করতে পারলেন না তাঁরা। অবশেষে—

২৩ শে মে সকালবেলার কথা। সত্যর বাবা তখন বাড়ি ছিলেন না, বৈষয়িক কাজে বাইরে গেছেন। বাড়ির আর সবাই সত্যকে ঘিরে বসে। সত্য শূন্যে হস্তাবর্তন করে মিছরি আর ফুল আমদানি করে উপস্থিত সবার মাঝে বিতরণ করলেন। খবরটা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়লে পাড়ার লোকও সত্যর চারিদিকে এসে জড়ো হল। সত্য তাদের জন্যও ঠিক তেমনি করে শুধু মিছরি আর ফুল নয় অধিকন্তু এক এক ডেলা পায়েস এনে দিলেন।

এ কথা বাপের কানে যেতে বাপ পেড্ডা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে

মোটা একখানা লাঠি হাতে ঢুকলেন বাড়িতে ঃ ছেলেটা দু'মাস ধরে জ্বালাচ্ছে, এবার আবার নতুন ঢং সুরু করল. দেখাচ্ছি—এই বলে তিনি ছেলেকে মারতেই যাচ্ছিলেন এমন সময় প্রতিবেশীদের একজন তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, থামুন, ওঁর কাছে যেতে হলে একটু শুদ্ধ শান্ত হয়ে শুদ্ধমনে যান ।

এতে বাপ পেড্ডার রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ছেলের সামনে গিয়ে ধমকে উঠলেন,—অনেক জ্বালিয়েছ এবার থামো, কিসে ধরেছে তোমায় ? কি তুমি ? ভূত অপদেবতা, দেবতা না পাগল ?

উত্তেজিত ক্রুদ্ধ পিতার প্রশ্নে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে অতীব শান্ত এবং দৃঢ় কণ্ঠে সত্য উত্তর দিলেন, আমি সাইবাবা ।

ছেলের কথা শুনে পেড্ডা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে, লাঠিটা তাঁর হাত থেকে মাটিতে খসে পড়ল, সত্য তখন বাপকে বলে চলেছেন, আমি আপনার সকল দুঃখ দূর করতে গৃহকে পবিত্র করতে এসেছি ।

ব্যাপার বুঝতে না পেরে বাড়ির একজন তখন সত্যকে বলে উঠলেন, সাইবাবা, সাইবাবা—কি বলছিস তুই, এর মানে কি ?

সত্য এর উত্তরে বললেন,—তোমাদেরই বংশের বেঙ্কাবধূতা আমায় তোমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করতে প্রার্থনা করেছিলেন, তাই আমি এসেছি ।

সত্যদের বংশের নাম রাজু বংশ। এই বংশে না কি বেঙ্কাবধূতা নামে এক ধর্মপ্রাণ মহাত্মা সত্যিই ছিলেন, কিন্তু রাজু বাড়িতে সত্যের চারিধারে যে সব লোক এসে দাঁড়িয়েছেন, তাদের মাঝে দু একজন বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ সাইবাবার নাম শোনেন নি। যাঁরা শুনেছেন তাঁরাও জানেন না তিনি আসলে কি। বাবা ত—একটা মুসলমানী ফকিরকেই ত লোকে বাবা বলে। পেড্ডাও নামটা শুনে ভাবলেন, কোন মুসলান ফকিরের প্রেতাত্মাই তাঁর ছেলের দেহে ঢুকেছে ।

পড়শীরাও শুনে ভাবছেন সত্যি ব্যাপার কি. সত্য কি করে কোথেকে এই সব আমদানি করে আর অসুখটা হবার পরে কথাও ত বলে সে এক বৃদ্ধ ঋষির মত. আর এই যে মুসলিম সাইবাবা ইনিই বা কে ?

পুত্তাপর্তি অঞ্চলের অতি কম লোকেই সাইবাবার নাম জানে। বাবা বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন, হিন্দু না মুসলিম— তাও কেউ বলতে পারে না। শেষে শোনা গেল মাইল পঁচিশেক দূরে পেনুকুণ্ডায় এক গবর্ণমেন্ট অফিসার আছেন, তিনি নাকি সাইবাবার পরম ভক্ত। সত্যনারায়ণকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সেই অফিসারের কাছে। অফিসার সব কিছু শুনে বললেন, আপনাদের এ ছেলের মাথা খারাপ হয়েছে, কোন মনোবিদকে দেখান।

শুনে সত্য অমনি বলে উঠলেন, মাথা খারাপ হয়েছে কার, আপনার না আমার ? পুজারী আপনি, যে সাইকে আপনি পূজা করেন, তাঁকে চিনতে পারলেন না ? এই দেখুন বলেই শূন্য থেকে ভস্ম এনে ঘরের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপার কিছু বোঝে না কেউ। সত্য নিজেকে সাইবাবার অবতার বলে ঘোষণা করেছেন, হিন্দুরা অবশ্য পুনর্জন্ম আছে বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সাইবাবাই যে এবারে সত্য হয়ে জন্মেছেন এর প্রমাণ কি, অফিসারের কথা, তাঁর হাবভাব ত এ রহস্য ভেদে কোন সাহায্য করল না, কিন্তু এই রকম একটা কিছু না হলে সত্যই বা সিদ্ধ যোগীর মত এমন অলৌকিক শক্তি লাভ করল কি করে—ভাবতে লাগলেন সত্যের সঙ্গীরা !

বৃহস্পতিরবার গুরুবার। সত্য পেনুকোণ্ডা থেকে ফিরে আসবার পরে কিছু বিশ্বাস কিছু সন্দেহ নিয়ে ঘরে বসেছে লোকজন সত্যনারায়ণ রাজুর চারিধারে। তাদের মাঝে থেকে হঠাৎ একজন সত্যকে বলে বসল, তুমিই যে সাইবাবা, তা আমরা কিসে বুঝব ?

ঘরের কোণে একটা পাত্রে এক রাশ জুঁইফুল ছিল, সত্য তার দিকে

আঙ্গুল নির্দেশ করে বললেন, দাও ঐ গুলি আমার হাতে।

ফুলগুলি সত্যর হাতে এনে দেওয়া হ'লে সত্য সেগুলি ছুড়ে ফেলে দিলেন ঘরের মেঝেতে, সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখলেন মেঝেতে ফুলগুলি এমন ভাবে গিয়ে পড়েছে যে তা দিয়ে তেলেগু অক্ষরে 'সাইবাবা' এই নামটি লেখা হয়ে গেছে। সত্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা ক্রমে পালটাতে লাগল : ছেলেমানুষি বা পাগলামি এ তো নয়। তবে কি, ব্যাপার কি ?

যেদিন তাঁকে বিছে কামড়েছিল বলে মনে করা হয় তার প্রায় ছ'মাস পরে তাকে উরবাকণ্ডের স্কুলে পাঠানো হ'ল। এখানে এসেও তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে শূন্যে হস্ত সঞ্চালনে ভস্ম, শিরদির বাবার ফটো আমদানি করতেন, আর আনতেন খেজুর ফুল ইত্যাদি. বলতেন শিরদির বাবার ভক্তেরা তার সমাধি মন্দিরে এইসব দিয়ে তাঁর পুজো করে গেছে।

উরবাকণ্ডে যাবার আগে সত্যর দিদি বেনকাম্মা একদিন সত্যকে বললেন, তুই ত শূন্য থেকে কত কি আমদানী করিস, আর নিজে তুই সাইবাবা বলিস, তা একখানা ছবি এনে দে না আমায়, রঙিন ছবি সাইবাবার।

দেব, আসছে বৃহস্পতিবার দেব।

সে বৃহস্পতিবার আসবার আগেই সত্য উরবাকণ্ডের স্কুলে চলে গেলেন। দিদি বেনকাম্মা ভাবলেন, সত্য ভুলে গেছে, যা'ক পরে দেবে।

সেই বৃহস্পতিবারের রাত্রে বেনকাম্মা তাঁর ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছেন, এমন সময় দরজার বাইরে থেকে কে যেন ডাকছে শুনে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। উঠে বসে আবার শুয়ে পড়লেন তিনি। হঠাৎ ঘরে জোয়ারের বস্তার পাশে কি রকম একটা শব্দ হ'ল। কে জানে— ইঁদুর না সাপ ? আলো জ্বাললেন বেনকাম্মা। বস্তার পাশে গোল করে একটা মোটা কাগজ জড়ানো। এ ছিল না ত, কোত্থেকে

এল। উঠে জড়ানো কাগজটি হাতে নিয়ে খুলে দেখেন এক রঙীন ছবি এক বৃদ্ধ সাধু তাঁর ডান পাটি বাঁ জানুর উপর দিয়ে বসে আছেন। বুঝলেন এই সাঁইবাবা।

* * * *

সত্যনারায়ণ যখন নিজেকে শিরদির সাঁইবাবার অবতার বলে ঘোষণা করেছেন তার এক বৎসর পরের কথা। সত্য তখন পুত্তাপর্তিতে। সত্যের ঘোষণা শুনে চিনাচোলির রানী এলেন পুত্তাপর্তিতে। রানী বিধবা। স্বামী তাঁর শিরদির সাঁইবাবার পরম ভক্ত ছিলেন। শিরদির বাবা আবার নতুন দেহ ধারণ করে এসেছেন শুনে রানী কিছুটা কৌতুহলী হয়ে কিছুটা বা নতুন বাবাকে পরখ করবার জন্যই এলেন। এসে অনেক অনুনয় বিনয় করে নিয়ে গেলেন সত্যকে, চিনাচোলিতে। ভক্ত রাজার বাড়িতে শিরদির বাবার পায়ের ধূলি পড়েছে অনেকবার। সত্য এসেই যখন বলা শুরু করলেন—এখানে যে একটা অমুক গাছ ছিল সেটা ত দেখছি নে, ওখানে যে একটা কুয়ো ছিল, সেটা কই? কতকগুলি বাড়ি দেখিয়ে বললেন, আমার পূর্ব জন্মে যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন এগুলি ছিল না। রানী দেখলেন সত্য যা যা বলছেন সবই ঠিক। এবার আর কোন সন্দেহ রইল না তাঁর যে ইনি পূর্ব জন্মে এখানে এসেছিলেন.। সত্যি ইনি শিরদির সাঁইবাবার অবতার।

সত্য এরপর রানীকে বললেন, পূর্বজন্মে আপনার স্বামীকে আমি একটা ছোট পাথরের মূর্তি দিয়েছিলাম। সেটা আছে ত?

রানী এ মূর্তির কথা জানতেন না, বাবার কথায় খোঁজা হ'ল মূর্তি। শেষে পাওয়াও গেল।

নিরক্ষর, অর্বাচীন গ্রাম্যলোকের কথা নয়, উচ্চশিক্ষিত, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যে সব বিচক্ষণ লোকের কথা আদালতে সত্য প্রমাণ বলে গৃহীত হয়, তাঁরাই অল্পবয়সী সত্য সাঁইবাবার যে অলৌকিক যোগৈশ্বর্যের

বিবরণ দিয়েছেন তা শুনলে শিরদির সাইবাবাই যে বর্তমান সত্য সাইবাবা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন—এ কথা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। দু'একটা বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি।

মাদ্রাজের বিখ্যাত সার-ব্যবসায়ী শ্রীবেঙ্কটমুনি সত্য সাইবাবার আশ্চর্য সিদ্ধাইয়ের কথা শুনে ১৯৪৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে এসে বাবার অনেক বিভূতির লীলা দেখে গেছেন। এর নয় বৎসর পর ১৯৫৩ সালে তাঁর জীবনে যা ঘটল তাই শুধু আমি এখানে বিবৃত করছি।

এই সালে শ্রীবেঙ্কটমুনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিমানে ভূপর্যটনে বেরুলেন। প্যারীতে এসে তাঁরা ঠিক করলেন, কয়েক হপ্তা ওখানেই কাটাবেন। পথে চলতে চলতে কিছু জিনিস কিনবার প্ল্যান হ'ল তাঁদের। সঙ্গে ট্রাভেলিং চেক এনেছেন, তাই ভাঙানো যাবে। শ্রীমতী বেঙ্কটমুনি চেক বের করতে তাঁর হ্যাণ্ড ব্যাগটা খুললেন, ওর মাঝেই ত রেখেছেন তিনি চেকের ফোল্ডার। কিন্তু ব্যাগ খুলে কম্পিত বক্ষে তিনি দেখলেন, আশ্চর্য, চেক ফোল্ডার নেই ত সেখানে! তবে? তা হ'লে চেক্ কি তিনি সুটকেসে রেখেছেন? হবেও বা!

ফিরে এলেন তাঁরা হোটেলে। এসে স্বামী-স্ত্রী দুইজনার সুটকেসেই তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল কোনটাতেই চেক নেই। হ্যাণ্ড ব্যাগটাও খুলে আবার ভালো করে খুঁজলেন শ্রীমতী। না, নেই। চেকগুলি তা হ'লে ত হারিয়েই গেছে, কিন্তু কোথায় হারাল তাও কিছু বুঝে উঠলেন না কেউ। শ্রীমতীর অবশ্য বেশ মনে আছে বোম্বাই ছেড়ে আসার আগে চেকগুলি তাঁর হ্যাণ্ড-ব্যাগেই ছিল। যাই হ'ক এখন ত হ'ল মহাসংকটের অবস্থা, বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছেন অথচ হাতে এমন রেস্ত নেই, যাতে হোটেলের বিল পুরো শোধ করা সম্ভব হবে। মহা ভাবনায় পড়লেন দু'জন। অনেক ভেবে চিন্তে শেষে তাঁরা সাইবাবার কাছে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে একটা তার করলেন।

এ করবার পর মনে তাঁদের একটু স্বস্তি ফিরে এল : যেমন করেই হ'ক বাবার কাছ থেকে নিশ্চয়ই কোন সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু এ সাহায্য যে এমন অলৌকিক ভাবে হবে তা কি তারা তখন ভাবতে পেরেছেন ?

তার পাঠানোর একদিন কি দু'দিন পর আবার বেরিয়েছেন—টাকার ব্যবস্থা হ'লে তাঁরা প্যারী থেকে কি কি জিনিস কেনা যায় তাই দেখতে। একটা দোকানে পছন্দসই জিনিস দেখে তার নাম আর দাম টুকে নেবার জন্যে পেন্‌সিল আর নোট বই বের করতে নিজের হ্যাণ্ড-ব্যাগটা খুললেন : আরে একি, ট্রাভেলার্স চেকের ফোল্ডার যে চোখের সামনে সব কিছুর উপরেই রয়ে গিয়েছে। স্বামী স্ত্রী দুইজনেই এ ব্যাগটার ভিতরে যে কতবার খুঁজেছেন, জিনিসপত্র নামিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন।

খোওয়া যাওয়া ফোল্ডারটা তা হ'লে বাবাই ত তাঁর অলৌকিক শক্তি বলে পাঠিয়েছেন—এই ব্যাগের ভিতরে। বিস্ময় আর কৃতজ্ঞতায় জল এসে গেল স্বামী-স্ত্রীর চোখে। ধন্যবাদ জানিয়ে আবার তার পাঠালেন তাঁরা বাবাকে।

দেশে ফিরে এসে বাবার কাছে গিয়ে যথাকালে অলৌকিকভাবে এই সাহায্যের জন্য বাবাকে তাঁরা যখন ধন্যবাদ জানালেন, বাবা তা শুনে শুধু একটু হাসলেন।

হনুমান প্রসাদ রাও মাদ্রাজের এক বিশিষ্ট নাগরিক। একবার জন্মাষ্টমীর দিনে বাবা এঁদের মাদ্রাজের বাড়িতে ছিলেন। বাবা ঐ দিন রাওজীর বসবার ঘরে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ বলে উঠলেন, আজকের দিনে দেবতারা আমায় কিছু মিষ্টি খেতে দিতে এসেছেন। এই বলেই তিনি তাঁর দুই হাত বাড়ালেন শূন্যে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ তাঁর হাতে কোত্থেকে যে এক কাঁচের বাটি ভরতি মেঠাই এল বুঝতে পারলেন না রাওজী। ভারতের নানা প্রদেশের নানা রকম সুস্বাদু মেঠাই।

এরপর হনুমান প্রসাদের দিকে চেয়ে বাবা বলবেন, বালকৃষ্ণকে যেন ঘুম পাড়াচ্ছেন—এমন ঘুম পাড়ানি গান গাইতে গাইতে ওড়নার ভাঁজের ভেতর থেকে চন্দনকাঠের একটা গোপাল মূর্তি বের করলেন। রাওজীর বাড়ীতে এমন কোন মূর্তি ত আগে ছিল না।

রাওজীর বাড়িতে কাঁচের পাত্র এবং চন্দনকাঠের গোপাল মূর্তিটি এখনও রয়েছে।

* * * *

বাবার সঙ্গে মি. মারফেট এসেছেন 'হরস্হিলে'। আছেন ওখানকার সারকিট হাউসে। একদিন বিকেলে বাবা দলবল নিয়ে মোটরে বেড়িয়ে এসে তাদের নিয়ে উঠলেন একটা পাথুরে উঁচু জায়গায়। ওখানে পায়চারি করবার সময় বাবা ছোট ছেলের মত কিছু পাথরের টুকরো কুড়োতে লাগলেন। কুড়োন, একটু নাড়াচাড়া করেই আবার তা ছুড়ে ফেলে দেন। শেষের এক টুকরো আর তিনি ফেললেন না, হাতে করে নিয়ে এলেন নিজের কামরায়। টুকরোটা একটু বড় মতই, হাত মুঠ করলে যেমনটা হয় ঠিক সেই মত।

ঘরে এসে কার্পেটের উপর বসলেন বাবা, আর সবাই বাবাকে ঘিরে বসলেন। বাবা নানা কথা আলোচনা করতে করতে ছেলে-মানুষের মত পাথরটা নিয়ে যেন খেলা করতে লাগলেন: ওটা কয়েক ফুট উঁচুতে ছুড়ে দেন, মেঝেতে এসে পড়ে, আবার ছোড়েন। এমনি করতে করতে একবার মারফেটের কাছে ছুড়ে দিয়ে বললেন, দেখুন ত এটা খেতে পারেন কি না?

মারফেট আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন এ কি বলেন, বাবা, পাথর খাবো কি করে?—নুড়িটা হাতে নিয়ে নেড়েচড়ে দেখলেন, খাঁটি গ্রাণীট পাথর ছাড়া আর কিছু এ নয়, মাঝে মাঝে এক একটু ছেদা আছে।

মারফেট পাথরটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, না, বাবা, আমি পারব না। পাথর খাব কি করে?

বাবা সেটা হাতে নিয়ে কথা বলতে বলতে আবার আগের মত

উপরের দিকে ছুড়তে লাগলেন।

তাজ্জব কিছু ঘটে কি না দেখবার জন্যে সবার দৃষ্টিই বাবা এবং প্রস্তর-খণ্ডের দিকে নিবদ্ধ। শেষবার যখন টুকরোটা গালিচার উপরে এসে পড়ল, তখন মারফেট দেখলেন—আকারটা ওর ঠিক আগের মতই আছে বটে, কিন্তু রঙটা যেন বেশ একটু ফিকে হয়ে গেছে।

বাবা এবার সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মারফেটের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, দেখুন ত, এবার এটা খেতে পারেন কিনা?

এবার এ জিনিস দেখে মারফেটের বিস্ময় আর আনন্দের অন্ত রইল না। আগেকার সেই পাথর এ ত নেই, এ যে মস্ত বড় একটা মিছরির ডেলা। বাবা ওটা ভেঙে ছোট ছোট টুকরো করে সবাইকে খেতে দিলেন। সবাইকে সম্মোহিত করলেন না ত বাবা? —এই ভেবে মারফেট এক টুকরো পকেটে রেখে দিলেন। না, সন্দেহের কিছু নেই, পরেও ওটা মারফেটের কাছে মিছরির টুকরো হয়েই রয়ে গেল।

হরস্ হিলে থাকবার সময়ই বাবার আর এক অলৌকিক লীলা দেখে স্তম্ভিত হ'লেন মারফেট এবং তাঁর স্ত্রী আইরিস। সারকিট হাউসের বাগানে বেড়াচ্ছেন বাবা, সঙ্গে দুটি ছেলে এবং মারফেট। ঘুরতে ঘুরতে বাবা কখনও একটা বেরি কখনও বা ফুলের কুড়ি তুলছেন তারপর পাকা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর মত তার দিকে একদৃষ্টি চেয়ে কি পরীক্ষা করে তা ছুড়ে ছুড়ে ফেলছেন। এরপর একটা ঝোপ-থেকে একটা ফুলের কুড়ি তুলে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে মারফেটের হাতে দিয়ে বললেন, রাখুন এটা।

এরপর সিঁড়ি বেয়ে সারকিট হাউসে উঠে বাবা আর তার নিজের কামরায় গেলেন না, মারফেট দম্পতির ঘরে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। মারফেট তাঁর স্ত্রী এবং সঙ্গের ছেলে দুইটি বসলেন বাবার চারিধারে মেঝের গালিচায়।

বাবা এবার মারফেটের কাছ থেকে ফুলের কুড়িটি চেয়ে নিয়ে দুই আঙুলে ধরে বললেন, কিসের কুড়ি এটা ?

ওরা কেউই বলতে পারলেন না।

এটাকে কিসে রূপান্তরিত করলে খুশী হ'ন আপনারা ?

যাতে আপনার খুশি।

বাবা এরপর কুড়িটা তাঁর ডান হাতের তালুতে রেখে হাত বন্ধ করে তাতে কয়েক বার ফুঁ দিলেন, তারপর মারফেটকে বললেন, হাত পাতুন ত এবার।

মারফেট হাত পাতলে বাবার খোলা হাত থেকে তাঁর হাতে যা পড়ল, সে ত আর সেই আগের ফুলের কুড়ি নয়, ঝক্‌ঝকে জ্বলজ্বলে অতি সুন্দর একটা হীরে, আকারটা তার ঐ ছোট ফুলের কুড়িরই মত। বিস্ময়ে মারফেট দম্পতি একেবারে নির্বাক্।

হরস্ হীলে থাকতে থাকতেই সাইবাবা আর একটা যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন সে বুঝি এর চেয়েও তাজ্জব ! একদিন সন্ধ্যায় বাবার ঘরে বাবাকে ঘিরে সবাই বসে আছেন, নানা ধর্ম-কথা হচ্ছে এমন সময় বাবা মারফেটের দিকে চেয়ে বললেন, আপনার জন্ম কোন সালে ?

মারফেট নিজের জন্ম-সাল বললে বাবা বললেন, আচ্ছা দাঁড়ান, আমেরিকা থেকে ঐ সালে তৈরী একটা মুদ্রা এনে উপহার দিচ্ছি আপনাকে।

এই বলেই তিনি তাঁর ডান হাতটা উপুড় করে মারফেট এবং অন্যান্য সবার সামনে চক্রাকারে ঘুরাতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন,—আসছে, আসছে, এই যে এসে গেছে।

এই বলতে বলতেই হেসে হাতটা মুঠো করে ধরলেন তিনি মারফেটের সামনে ঃ হাত পাতুন।

মারফেট হাত পাতলে বাবার হাত থেকে তাঁর হাতে এসে পড়ল সোনালী একটা ভারী মুদ্রা। উল্লসিত মারফেট খুঁটিয়ে দেখলেন

এটা একটা খাঁটি মার্কিন দশ ডলারের মুদ্রা। স্বাধীনতার প্রতীক চিহ্নের নীচে যে সাল লেখা রয়েছে, সেই সালেই মারফেটের জন্ম।

মারফেটের বিস্ময়ের অন্ত রইল না, তিনি ভেবে পেলেন না— এ কি করে হতে পারল! ঐ ধরণের মুদ্রা ত এখন মার্কিন মুলুকে চালু নেই, ঐ সালের কোন মুদ্রা কারোর ঘরে থাকবারও কথা নয়। তবে!

° ° ° °

সাইবাবার ভক্ত শেষগিরি এবং তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই বেঙ্কটেশ্বরের হাতে একই ধরণের অতি সুন্দর অঙ্গুরী। অঙ্গুরীতে বেশ বড় রকমের পান্না বসানো, পান্নার চারিধারে ক্ষুদে ক্ষুদে হীরে। পান্নাটার দিকে চাইলে ওর মাঝে সাইবাবার মুখমণ্ডলের স্পষ্ট ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। এর মূলে সাইবাবার কিছু কৃপা থাকা সম্ভব মনে করে মারফেট একদিন শেষগিরিকে জিজ্ঞাসা করেই বসলেন, আপনাদের দুইজনের হাতেই একই ধরনের আংটি, আংটির পাথরের দিকে চাইলে বাবার মুখের স্পষ্ট ছায়া দেখা যায়, এ'হল কি ক'রে এর মূলে বাবার কিছু কৃপার কাহিনী আছে বলে মনে হচ্ছে, বলুন না একবার শুনি।

শেষগিরি মারফেটের কথা শুনে বেশ একটু আনন্দের সঙ্গে বললেন, আপনার অনুমান সত্যি। বাবার কৃপাতেই এই অদ্ভুত জিনিস পেয়েছি আমরা দুই জনে। বাবা যেমন শূন্যে হাত ঘুরিয়ে নিজের খুশিমত জিনিস আনেন, তেমনি করেই এনে দিয়েছিলেন তিনি আমার ওটা। প্রথমে বাবা যখন ওটা আমায় দেন তখন অবশ্য আংটির চুনীর ভেতরে বাবার মুখের কোন 'সিলুহোট' দেখা যেত না, তাই আমি দুঃখ করে বাবাকে বললাম, এ আর আমায় এমন কি দিলেন আপনি? ঐ পান্না পাথরটার ভেতর যদি আপনার মূর্তির কোন চিহ্ন দেখতে পেতাম আমি তা হ'লেই মনে হ'ত হ্যাঁ, পাওয়ার মত কিছু একটা পেলাম!

স্বামীজী আমার কথা শুনে আংটিটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ নিজের হাতে ধরে রেখে আমায় ফিরিয়ে দিলেন, এর পান্নাটার দিকে তাকিয়ে দেখি তার মাঝে বাবার মুখের ছবি। অবিকল আমার আংটির মত যে আংটিটা বেঙ্কটেশ্বরের হাতে দেখেন সেটিও এমনি করে বাবাই তাকে দিয়েছেন।

০ ০ ০ ০

মিঃ কে. আর, কে. ভাট কর্মজীবনে এল, আই, সির ডিভিশনাল ম্যানেজার ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর অধিকাংশ সময় সস্ত্রীক প্রশান্তি নিলয়মেই থাকেন। বৈষয়িক কি এক কাজে তাঁর ব্যাঙ্গালোরের বাড়িতে যেতে হবে তাঁকে। কিন্তু হৃদ্‌রোগী তিনি। কিছুদিন যাবৎ বাঁ বুকটায় দারুণ যন্ত্রনা, ডাক্তারেরা গাড়ি চালাতে বারণ করেছেন। কি করা যায়? মারফেট কাছেই ছিলেন, সব কিছু শুনে বললেন, কুচ পরোয়া নেই, আমিই গাড়ি ড্রাইভ করে আপনাকে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যাব।

রওনা হবার আগে বাবার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে ইন্টারভ্যু-রুমে এসেছেন সবাই। ভাট পরিবারের গৃহদেবতা হলেন প্রভু সুব্রহ্মনীয়ম্। সাইবাবাকে শ্রীমতী ভাট ঐ চক্ষেই দেখেন তাই বাবাকে প্রণাম করতে ফুলতুলসীর অর্ঘ্যই সাজিয়ে এনেছেন। অর্ঘ্য দেওয়া হয়ে গেলে বাকী যা রইল তা থেকে কয়েকটা ফুল শ্রীমতী ভাটের মাথায় গুঁজে দিয়ে সবাইকে প্রসাদের (বিভূতি) জন্য অপেক্ষা করতে বলে বাবা বাকী ফুল তুলসী নিয়ে উপরে তাঁর ডাইনিং রুমে চলে গেলেন। নীচে ইন্টারভ্যু ঘরের ঠিক উপরেই বাবার ডাইনিংরুম।

ইন্টারভ্যু ঘরে মি· ভাটের বা পাশে দাঁড়িয়া মি· মারফেট আর তার স্ত্রী আইরিস, ভাটের ডাইনে শ্রীমতী ভাট।

মি ভাটের বেশ ঢেঙা চেহারা। ওঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি সব কথা বলছেন, এমন সময় আইরিসের নজরে পড়ল

উপরের সীলিং থেকে মি. ভাটের বরাবর কি যেন পড়ছে। চটে যাওয়া শুকনো রঙটাই কিছু হবে ভাবলেন আইরিস। মারফেটও দেখলেন। দেখলেন ওগুলি যখন মি. ভাটের মাথার ফুট দেড়েক উপরে। ওগুলি পড়ল এসে মি. ভাটের ঠিক বাঁ কাঁধের উপরে। কিন্তু এ কি আইরিস আগে যা ভেবেছিলেন তা তো নয়, এ যে তুলসীপাতা আর কয়েকটি ফুলের পাপড়ি।

ওগুলি মি. ভাটের বাঁ কাঁধে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মি. ভাটের মুখের ভাব পালটে গেল: বেশ একটু স্বস্তি বোধ করছেন যেন তিনি। কিন্তু সবাই তখন ভাবছেন এগুলি এল কোথেকে? বাইরে এমন কোন বাতাস নেই—যে তাতে ভেসে আসবে। শ্রীমতী ভাটের মাথা থেকেও ত যেতে পারে না, কারণ শ্রীমতী ভাটের উচ্চতা মি. ভাটের চেয়ে অনেক কম। ভাট দম্পতির বুঝতে বাকী রইল না যে বাবারই এ আর এক অলৌকিক কৃপা: উপরের ঘর থেকে নীরেট সীলিং এর ভিতর দিয়েই তিনি এ পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন বিনা উদ্দেশ্যে নয়, ঐ ফুল তুলসী মি. ভাটের কাঁধে পড়বার পর থেকেই তাঁর বাঁ বুকের ব্যথা সেরে গেল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। বাঙ্গালোরে আসার পথে তাঁর গাড়ী আর মারফেটকে চালাতে হ'ল না, তিনি নিজেই ড্রাইভ করে এলেন। আসার পর নিজেই ড্রাইভ করে মারফেটকে অনেক জায়গায় ঘোরালেন।

০ ০ ০ ০

শ্রীমতী ভাটের জীবনে সত্যসাইবাবার অলৌকিক লীলা দেখাবার সৌভাগ্য এবং কারণ ঘটেছে—এর অনেক আগে, ১৯৪৩ সালে। শ্রীমতী তখন ক্যান্সারে আক্রান্ত, জরায়ুতে ক্যান্সার। ডাক্তারেরা সব 'অপারেশানের' পরামর্শ দিচ্ছেন। এতেও সারবে বলে কোন গ্যারান্টি দিতে পারছেন না তাঁরা।

মি. ভাটের বিধবা মায়ের অপারেশানে আপত্তি। তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, তোমার বাবারও ক্যান্সার হয়েছিল, আমাদের

গৃহদেবতা সুব্রহ্মনীয়ম তা সারিয়েছিলেন, অপারেশান করতে হয় নি। তোমার স্ত্রীর ব্যামোও তিনিই সারাবেন, অস্ত্রোপচার করবার দরকার নেই।

বৃদ্ধা মহিলার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে তরুণ ভাট দম্পতি তাঁর কথাই মাথা পেতে নিলেন। অস্ত্রোপচারের চেষ্টা থেকে বিরত হলেন।

শ্রীমতী ভাট অসুস্থ, শয্যাশায়ি, সুতরাং গৃহদেবতার পূজা, তাঁর কাছে শ্রীমতীর রোগ নিরাময়ের প্রার্থনা ইত্যাদি চালাতে থাকলেন শ্রীভাটের শুদ্ধাচারিনী ভক্তিমতী বিধবা মা-ই। রোজ অনেকক্ষণ ধরে একাগ্রমনে করেন তিনি এসব। অসুস্থা শ্রীমতী এদিকে ক্রমেই দুর্বল আর শীর্ণ হয়ে পড়ছেন। প্রায় ছ মাস এমনি কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন রাত্রে—

শ্রীমতী অর্ধতন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখলেন একটা গোখরো সাপ তাঁর বিছানার চারিদিকে চক্কোর দিচ্ছে। স্বামী বৈষয়িক কাজে বাইরে গিয়েছেন, শাশুড়ীই শ্রীমতীর ঘরে শোন। সাপ দেখে ভয় পেয়ে শ্রীমতী বিছানার পাশের সুইচ্ টিপে আলো জ্বেলে শাশুড়ীকে জাগিয়ে তুললেন। কিন্তু একি, ঘরে কোন সাপ নেই ত!

তখনই আবার আলোটা নিভিয়ে দিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আবার সাপ। কিন্তু সাপ এবার ত আগেকার সাপ রইল না, সাপ এবার সুব্রহ্মনীয়মের মূর্তিতে রূপান্তরিত। পূজাঘরে ঠাকুরের মূর্তি যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি। ঠাকুর যেন ঠিক তাঁর উপর উড়ে বেড়াচ্ছেন, তারপর তাঁর হাতের অস্ত্র 'বেলয়ুধন' দিয়ে শ্রীমতীর বুক ছেঁদা করে তাঁকে নিয়ে চললেন তিনি—কোথায়। চোখ মেলে দেখলেন শ্রীমতী একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় প্রভু সুব্রহ্মানীয়মের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি। প্রভুকে দেখামাত্রই তিনি হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন। প্রভু তাঁকে

জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাঁর কাছেই থাকতে চান, না সংসারে ফিরে যেতে চান। শ্রীমতী এতে বুঝলেন জীবন আর মৃত্যুর মাঝে কোনটা তাঁর কাম্য। নিজের স্বামী এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য তাঁর বেঁচে থাকাই প্রয়োজন মনে হওয়ায় তিনি বললেন তিনি সংসারেই ফিরে যেতে চান।

তাঁর কথা শুনে সুব্রহ্মনীয়ম বললেন, ঠিক আছে, তোমার অসুখ সেরে গেছে, আমিই তোমায় রক্ষা করব। আর আমাকে স্মরণ করলেই আমাকে তুমি পাবে। এবার ঘরে ফিরে যাও।

কি করে যাব?

প্রভু দেখালেন তাঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে একটা লম্বা ঘোরানো সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। শ্রীমতী ভাট সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে সুরু করলেন। এরপর কেমন যেন তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলেন তখন দেখেন নিজের কামরায় নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন। শাশুড়ীকে জাগিয়ে তখন তিনি সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে জানালেন, স্বামী ফিরে এলে তাঁকেও। এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আর কাউকে বলেন নি তিনি।

সেই রাত্রি থেকেই তিনি সুস্থ সবল হয়ে উঠতে লাগলেন ক্যানসারের কোন লক্ষণ আর দেহে রইল না।

আরও তাজ্জব হচ্ছে এর পরের কথা—

এই ঘটনার বিশ বৎসর পরে ভাট দম্পতি সত্য সাইবাবার নাম শুনে প্রশান্তি নিলয়মে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে। শ্রীমতী বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা বলে উঠলেন, অনেক আগেই ত আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,—বিশ বছর আগে।

শ্রীমতী হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, না স্বামীজি, আপনাকে আমি এই প্রথম দেখলাম।

কেন, আপনি যখন মহীশুরে ছিলেন তখন আমি আপনার কাছে

গিয়েছি ত! এই বলে স্বামিজী শ্রীমতী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শহরের কোন ঠিকানায় থাকবার সময় সুব্রহ্মানীয়মের দেখা পেয়েছিলেন—সব কিছু বলে গেলেন। এরপর স্বামীজি শ্রীমতী ভাটকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নিজের থাকবার জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে নীচে তাকিয়ে দেখতে বললেন। শ্রীমতী তাকিয়ে দেখেন প্রভু সুব্রহ্মানীয়ম তাঁকে যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে বলেছিলেন, এ ত ঠিক সেই সিঁড়িই। দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না শ্রীমতী ভাটের।

ব্যাপারটা শ্রীমতী ভাটকে আরও ভাল করে বুঝাতে বাবা এবার হস্তাবর্তন করে একটা ছবি এনে শ্রীমতীকে দিলেন, ছবিতে সুব্রহ্মানীয়মের 'সোমসূত্রে' (রথে) বসে রয়েছেন সাইবাবা, তার দেহ জড়িয়ে রয়েছে একটা গোখরো। দেখে শ্রীমতী ভাটের যেন জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। তিনি বুঝলেন ভগবান যে কোন মূর্তিতে মানুষের সামনে আবির্ভূত হতে পারেন: বিশ বছর আগে তাঁর সামনে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন গৃহদেবতা সুব্রহ্মানীয়মের রূপ ধরে, আজ তিনি এসেছেন সাইবাবা মূর্তিতে। চোখের জলে ভেসে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

° ° ° °

মি. এন কস্তুরি লিখেছেন—

১৯৫৯ সালের ২১শে জুন দেড়টার সময় বাবার দেহের তাপ হঠাৎ ১০৪-৫এ উঠল দেখে তাঁর ঘনিষ্ঠ ভক্তেরা সব শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আশ্চর্য—মিনিট পাঁচের পরেই তা নেমে ৯৯। হঠাৎ এমন কেন হ'ল কেউ বুঝে উঠলেন না, বাবাও কিছু বললেন না।

সন্ধ্যার পর বাবা তাঁর কয়েকজন ভক্তদের নিয়ে বসে রাত্রের খাবার খাচ্ছেন, ভক্তদের মাঝে একজন আছেন যিনি মাদ্রাজ থেকে এসেছেন। যুবক। পরের দিনই তিনি মাদ্রাজ ফিরে যাচ্ছেন। বাবা হঠাৎ তাঁকে বলে বসলেন, তুমি কাল বাড়ি গিয়ে তোমার মাকে বলো

ভবিষ্যতে আগুন সম্বন্ধে তিনি যেন আর একটু বেশি সাবধান হ'ন।

সবাই কৌতূহলী : ব্যাপার কি? শুধালে বাবা বললেন,—ব্যাপার এমন কিছু নয়, মহিলা দুপুরে পূজাঘরে থাকবার সময় তাঁর শাড়ীটায় আগুন ধরে গিয়েছিল। ভাববার কিছু নেই, তাঁর শাড়ীটাই শুধু পুড়ে গেছে, দেহের কোন ক্ষতি হয় নি।

আহার পর্ব মিটে গেলে বাবার এক ভক্ত মাদ্রাজে ট্রাঙ্ককল করতে বাবার অনুমতি চাইলেন। মিললো অনুমতি। কল করা হ'লে ঐ মহিলাই এসে ফোন ধরলেন। মহিলার কাছে যা যা জানতে চাওয়া হ'ল তিনি তার যথাযথ বিবরণ দিলেন। এরপর মহিলার সঙ্গে কথা বলতে বাবা ফোনটা নিজে হাতে নিলেন। বাবা কি বলেন শুনবার জন্য ভক্তেরা সব উৎকর্ণ। তাঁরা শুনলেন মহিলার প্রশ্নে বাবা হেসে বলছেন—না, না, আমার হাতে লাগে নি, কিছুক্ষণের জন্য আমার টেম্পারেচার শুধু একটু বেড়ে গিয়েছিল।

০ ০ ০ ০

সত্য সাইবাবাকে শিরদির সাইবাবার অবতার বলে তাঁর ভক্তেরা মনে করেন, তিনি নিজেও তাই বলেন। এ সম্বন্ধে একবার এক ভক্তের মনে সন্দেহ জেগেছিল, তারপরে যা ঘটল সেই কাহিনীই বিবৃত করা যাচ্ছে এখানে—

১৯৫০ সালের কথা। মি. আর. পি. সারতি তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণ মেননের এডিশনাল সেক্রেটারী। তাঁর স্ত্রীর নাম কমলা সারতি। কমলা বেহালা বাজানো শেখেন ডি. এস. চিদাবরম নামে ৪৫ বৎসর বয়স্ক এক বেহালাবাদকের কাছে। এরা দুইজনেই ৫।৬ বার পুত্তাপর্তিতে গিয়েছেন। দিল্লীতে মি সারতির বাড়ির একটা ঘরেই থাকেন তখন চিদাবরম।

সেদিন সকালের দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের বেহালা বাজনা শিখাতে বেরিয়েছিলেন চিদাবরম, ফিরছেন নয়া আর পুরানো দিল্লীর মাঝের মিন্টো রোড দিয়ে সাইকেলে। ১১টায় তাঁর কমলাকে বেহালা

শেখানোর কথা।

সাইকেলে আসতে আসতে হঠাৎ তাঁর মনে হতে লাগল, আচ্ছা সাইবাবাকে ভক্তরা যা মনে করেন, সত্যিই কি তিনি তাই? তা যদি না হ'ন, তা হ'লে এত টাকাপয়সা খরচ করে মিছিমিছি পুত্তাপর্তিতে ছোটা কেন?

এমনি সব কথা মনে হতেই দেখেন এক বৃদ্ধ সাধু তাঁর পিছনে দ্রুত সাইকেল চালিয়ে আসছেন। চিদাবরম তাকিয়ে দেখেন সাধুর গায়ে একটা আলখাল্লা আর মাথায় শিরদির বাবা যেমন করে কাপড় বাঁধতেন, তেমনি করে কাপড় বাঁধা। বৃদ্ধ সাধু চিদাবরমের কাছে এসে সাইকেল থেমে নামলেন, চিদাবরমও নেমে তাঁকে নমস্কার করলেন। সাধু চিদাবরমকে বললেন, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। পথে বড় ভিড়, চল একটু নিরালা জায়গায় যাওয়া যা'ক। চিদাবরমের তাতে আপত্তি,—১১টায় তাঁকে যে ছাত্রীকে বেহালায় 'লেসন' দিতে হবে।

সাধু বললেন, চলো বেশি দেরী হবে না আমার, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

সাধুকে দেখে শিরদির বাবার মত মনে হওয়ায় চিদাবরম শেষে সাধুর কথায় রাজী হয়ে গেলেন। হাতে সাইকেল ধরে তাঁরা দু'জন তখন পাশের একটা নিরালা রাস্তা বেয়ে কিছুটা যাবার পর একটা সমাধির কাছে গেলেন। এখানে এসে সাধু সেই সমাধির উপর শিরদির বাবার ধাঁচে এক পায়ের উপর আর এক পা আড় করে রেখে বসলেন। সাধুকে সম্মান দেখাতে চিদাবরম তাঁর সামনের মাটিতেই বসলেন।

সাধু একটুখানি চুপ করে থেকে চিদাবরমকে বললেন—আমি কে বলে মনে হচ্ছে তোমার?

আপনাকে দেখে শিরদির বাবার মত মনে হচ্ছে।

বেশ, আমার হাতটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ ত—এই বলে

সাধু তাঁর করতলটা তুলে ধরলেন চিদাবরমের চোখের সামনে। আশ্চর্য—সাধুর করতল যেন ঠিক একটা আয়না হয়ে গেছে, আর তাতে ফুটে উঠেছে পুত্তাপর্তির সত্য সাইবাবার মূর্তি। তিনি একটা চেয়ারে বসে হাসছেন। চিদাম্বরম বিস্ময়বিমূঢ়চিত্তে চেয়ে রইলেন সেই মূর্তির দিকে।

এরপর সাধু তাঁর আলখাল্লা এবং ভিতরের জামা খুলে তাঁর বুকটা উন্মুক্ত করে ধরলেন চিদাবরমের সামনে। চিদাবরম সেখানেও দেখলেন পুত্তাপর্তির বাবার মূর্তি। বাবা একটা মালা জড়িয়ে বসে আছেন। এরপর সাধু চিদাবরমের পিঠে—ভক্ত কোন মুস্কিলে পড়লে সত্য সাইবাবা প্রায়ই যেমন করে বিভূতি মর্দন করে দেন ঠিক তেমনি করে বিভূতি লাগিয়ে তাঁকে কিছু মিছরি খেতে দিয়ে তাঁর আসন থেকে উঠে পড়লেন। বিভূতি এবং মিছরি দুইই সাধু হাত ঘুরিয়ে শূন্য থেকে আমদানি করলেন, ঠিক যেমনি করে সত্য সাইবাবা আনেন।

চিদাবরমের তখন বুঝতে বাকী রইল না—এ সাধু তাঁর আরাধ্য সাইবাবা ছাড়া আর কেউ ন'ন, সাধুকে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি তাঁর সঙ্গে সারতি-ভবনে আসতে। সাধু রাজী হ'লেন না।

অকস্মাৎ এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় চিদাবরম এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর আর সাইকেল চেপে বাসায় ফিরবার ক্ষমতা রইল না, একটা টাঙ্গা ভাড়া করে তাতে সাইকেল নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

এরপর থেকে সত্য সাইবাবার মহিমা সম্বন্ধে চিদাবরমের মনে আর কোন সংশয় রইল না।

০ ০ ০ ০

সাই ভক্তদের পূজাঘরে বাবার ছবির গায়ে যে শূন্য থেকে শুধু বিভূতি এসেই জমা হয়, তা নয়, অনেকের ঘরে পূজার অন্যান্য উপকরণ—যেমন ফুল, মালা ইত্যাদি এসেও ছবির গায়ে লেগে

থাকতে দেখা যায়। পুনার কে. ঈ. কুলকার্নি বাবার যে মহিমার পরিচয় পেয়েছেন তা আরও বিস্ময়কর।

পুনা শহরের শিরদি সাইবাবার একটি মন্দির আছে। কুলকার্নি প্রতি বৃহস্পতিবারে ঐ মন্দিরে বাবাকে প্রণাম জানাতে আসতেন। এক বৃহস্পতিবারে আসবার সময় ভক্তদের মাঝে বিতরণ করবেন বলে একটা থলিতে সত্য সাইবাবার ছয়খানা ছবি, আর তাঁর সম্বন্ধে হিন্দী আর ইংরেজীতে লেখা ছয় ছয়খানা করে পুস্তিকা নিয়ে এলেন। পূজার্থী ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করতে সুরু করে দেখা গেল তাঁর চারিদিকে প্রায় শ'খানেক ভক্ত বাবার ছবি এবং হিন্দীতে লেখা পত্রিকা পেতে দাঁড়িয়ে। গ্রামের লোক ইংরেজি পড়তে পারে না বলে ইংরেজির প্রার্থী নেই। এত লোকে চাইছে অথচ ছবি আর হিন্দী বই তখন তাঁর থলিতে মাত্র এক একখানা করে আছে। কুলকার্নির মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, তিনি উপস্থিত ভক্তদের পরের বার তাদের জন্য আনবেন বলে আশ্বাস দিয়ে অবশিষ্ট ছবি এবং হিন্দী বই বের করতে থলিতে হাত দিতেই দেখেন—এ কি—বেশ বড় বড় এক এক বাণ্ডিল ছবি আর বই এল কোথেকে এর মাঝে! নতুন বাণ্ডিলের বইগুলি সবই হিন্দী। সমবেত ভক্তদের সবার হাতেই বাবার ছবি এবং বই বিতরণ সেরে কুলকার্নি আরও তাজ্জব। বই আর ছবি উপস্থিত সবাই পেয়েছে, অথচ ছ'খানি ইংরেছি বই ছাড়া থলিতে আর কিছু নেই।

° ° ° °

ডক্টর ওয়াই. জে. রাও বিজ্ঞানী, হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া য়ুনিভার্সিটির ভূতত্ত্ব-বিভাগের প্রধান। এসেছেন পুত্তাপর্ত্তিতে সাইবাবার দর্শনে। বাবা তার সামনে একটা নিরেট পাথর অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করে তাঁকে যে উপদেশ দিলেন তারই বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে এখানে—

বাবা একদিন একটা ভাঙা গ্রানাইট পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে

ভূতত্ত্ববিদ রাওয়ের হাতে দিয়ে বললেন, কি রয়েছে এতে? উত্তরে ডক্টর রাও কতকগুলি ধাতব পদার্থের নামোল্লেখ করলেন।

বাবা অমনি বলে উঠলেন, না, না আমি ত সব শুনতে চাইছি না, আরও গভীরে।

তা হলে বলব—মলিকিউল, অ্যাটম্, ইলেকট্রন, প্রোটন এই সব।

উঁহু—আরও গভীরে যান।

এর চেয়ে বেশি কিছু ত আমার জানা নেই স্বামীজি।

বাবা তখন পাথরের টুকরোটি রাওয়ের হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে আঙ্,ল দিয়ে উঁচু করে ধরে জ্বলজ্যান্ত রাওয়ের চোখের সামনেই তাতে ফুঁ দিতে লাগলেন। এরপরে তিনি যখন সেটা রাওয়ের হাতে তুলে দিলেন তখন রাও দেখলেন সেটা ত আর আগেকার সেই এবড়ো থেবড়ো পাথর নেই, হয়ে গেছে সেটা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। বিজ্ঞানী রাও দেখলেন জিনিসটার রঙও কিছুটা পালটে গেছে।

বাবা রাওকে তখন বললেন, দেখলেন ত, আপনাদের ঐ মলিকিউল ও য়্যাটমের মাঝে আর কে আছেন। মাধুর্য এবং আনন্দই তাঁর স্বরূপ। মূর্তিটার পা ভেঙ্গে কিছুটা চেখে দেখুন ত?

বাবার কথা শুনে মূর্তির পা ভাঙতে কিছু অসুবিধা হল না মি· রাওয়ের। তিনি সেটা মুখে দিয়ে দেখলেন সেটা একটা মিছরির টুকরো। একটা অমসৃণ পাথরের টুকরো চোখের সামনে দেখতে না দেখতে কি করে একটা সুন্দর মূর্তি এবং মিছরি হয়ে যেতে পারে—বিজ্ঞানী রাও কিছুতেই তা ঠাওর করতে পারলেন না। তিনি শুধু এইটুকু বুঝলেন—জগতে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানুষের বুদ্ধির নাগালের বাইরে। বুঝলেন বিজ্ঞানী জগৎ রহস্যের প্রথম স্তরের কথাই জানতে পারেন, শেষ স্তরের কথা জানেন শুধু অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানী।

° ° ° •

বেঙ্কটগিরির রাজা এক রকম সব দিক দিয়েই অত্যাধুনিক। বিদ্যাশিক্ষা হয় তার ইংলণ্ডে, ফলে মিশেছেন তিনি আন্তর্জাতিক সমাজে। এ ছাড়া তিনি একজন বড় শিকারী এবং পোলো খেলায় ওস্তাদ। বেঙ্কটগিরিতে যেমন তাঁর প্রাসাদ আছে, তেমনি আছে, মাদ্রাজেও। কথাবার্তা হালচালে তিনি যেন একে-বারে খাঁটি ইংরেজ, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তিনি একেবারে গোড়া হিন্দু।

এ হেন বেঙ্কটগিরির রাজা সত্য সাইবাবার একজন পরম ভক্ত—অনেক দিন থেকেই। এই রাজার মুখে শোনা সাইবাবার অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা কিছু এখানে বিবৃত করা হচ্ছে—

একবার বাবাকে নিয়ে একদল লোক মোটরে করে মাদ্রাজ থেকে পুত্তাপর্তিতে যাচ্ছেন, রাজার মেজো ছেলেও রয়েছেন ঐ দলে। কিছুদূর যাবার পর অন্ধ্রের চিত্তুরের কাছে এসে রাস্তার ধারে গাড়ি থামানো হল, কি, না 'পিক্‌নিক্' করা হবে। আসল খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে বাবা দলের লোকদের বলে বসলেন, 'ডেসার্টের' জন্যে—তোমাদের কে কি ফল খেতে চাও বলো ?

মজা দেখতে কেউ বললেন, আমি আম খেতে চাই, কেউ বললেন আমি একটা আপেল খেতে চাই, কেউ চাইলেন কমলা খেতে, কেউ বললেন—একটা রসালো পীয়ারা।

শুনে বাবা বললেন, ঠিক আছে, ঐ যে ওখানে একটা বুনো গাছ দেখা যাচ্ছে—ওখানে গেলেই তোমরা যে যা খেতে চাও তা ঐ গাছেই পাবে।

কৌতূহলী সবাই ছুটলেন ঐ বুনো গাছটির দিকে। গিয়ে দেখেন বাবা যা বলেছেন—তা একেবারে বিলকুল ঠিক—গাছের একটা ডালে ফলে রয়েছে আম, আপেল, কমলা আর পীয়ারা। ওরা তখনই

পেড়ে খেলেন, আর কি যে সে সব ফলের স্বাদ, এমনটি বুঝি আর কোনদিনই তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি।

আর একবারের কথা, পুত্তাপর্তিতে তখন হাসপাতাল খোলা হয় নি। বাবার এক ভক্তদর্শক য়্যাপেণ্ডিসাইটিসে দারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। কাছাকাছি বহু মাইলের মধ্যে কোন সার্জেন নেই। বেঙ্কটগিরির রাজকুমার এবং আরও দশবারো জন লোকের সামনে বাবা শূন্যে হাত ঘুরিয়ে একখানা অস্ত্রোপচারের ছুরি আনলেন। তারপর রোগী যে ঘরে কাতরাছিল সেই ঘরে ঢুকলেন। রোগীর ঘরে আর কোন লোক না থাকায় বাবার অপারেশন করা কেউ নিজের চোখে দেখতে পেল না বটে, কিন্তু বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছিন্ন য়্যাপেন-ডিকসটা সবাইকে দেখালেন, তা ছাড়া সবাই রোগীর ঘরে গিয়ে দেখলে তার ছুরিতে কাটা ছেড়া জায়গাটা এর মাঝে জুড়ে গেছে, আপারেশনের সামান্য একটা দাগ রয়েছে মাত্র সেখানে। আপারেশনের সময় রোগীর যন্ত্রণাবোধ হরণ করতে বাবা কিছু বিভূতি আর তাঁর ঐশী শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

সত্য সাইবাবার আর একটি লীলা রাজার মুখে শোনা গেছে। রাজা এর প্রত্যক্ষদর্শী। ব্যাপারটা ঘটেছে বাবার সঙ্গে রাজার প্রথম সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরেই বেঙ্কটগিরিতে ১৯৫০ সালে। সাইবাবার বয়স তখন মাত্র চব্বিশ, এসেছেন বেঙ্কটগিরিতে।

রাজপ্রাসাদ থেকে বিশ ত্রিশ জনের একটি দল বাবাকে সেখানকার পল্লী অঞ্চল দেখাবে বলে মোটরে করে বেরুল, সঙ্গে রাজা ও রাণী। বাবা এ এলাকায় এই প্রথম এসেছেন, কোথায় কি আছে জানেন না, রাজাকে বললেন, পথে কোথাও কোন বালুচর পড়লে গাড়ি থামাবেন ত!

কয়েক মাইল যাবার পরই সামনে একটা শুকনো নদী পড়ল, জল নেই তাতে, আছে শুধু বালু, বালুর বেশ পুরু স্তর। গাড়িগুলি থামানো হ'ল সেখানে। তখন স্বামীজি গাড়ি থেকে নেমে সেই

বালুর উপরে গিয়ে বসলেন আর সবাই তাঁকে ঘিরে বসলেন। কিছুক্ষণ একথা ওকথার পর বাবা তাঁর আলখাল্লায় আস্তিন কনুই অবধি গুটিয়ে নিয়ে সামনের বালুর ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এরপর বালুর মাঝে করাত চালানোর মত কেমন এক শব্দ হতে থাকল।

রাজা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—শব্দ শোনা যায় কিসের ?

বাবা হেঁয়ালির মত করে বললেন, কৈলাসে কিছু তৈরী হচ্ছে।

এরপর বাবা যখন হাতটা বালুর ভিতর থেকে বের করলেন তখন তাঁর চারিদিকে প্রায় দশফুট ব্যাসার্ধ নিয়ে যেন একটা নীল আলোর ঝিলিক খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকিয়ে দেখলেন বাবার হাতে রয়েছে প্রায় আট ইঞ্চি উঁচু শ্বেত স্ফটিকে তৈরী রাম সীতার মূর্তি। বাবা ঐমূর্তি অবগুণ্ঠনবর্তী বেঙ্কটগিরির রাণীর হাতে দিয়ে পরের দিন অবধি ওটা রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে রাখতে বললেন।

পরের দিন রেশমী কাপড়টা যখন রাম-সীতার মূর্তি থেকে খুলে ফেলা হ'ল তখন দেখা গেল—মূর্তির আকার অবিকল তাই আছে, কিন্তু শ্বেতপাথর কি করে নীল পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

বেঙ্কটগিরির রাজভবনের পূজাঘরে এই রামসীতার মূর্তি এখনও রয়েছে। বর্ণ তার বালু থেকে বের করবার সময় যে নীল আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল ঠিক তারই মত।

০ ০ ০ ০

ম্যাডাম ইন্দিরা দেবী রুশীয় মহিলা, আমেরিকাবাসিনী। ভারতীয় ভাবধারার উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় নাম তিনি গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ায় তাঁর যোগাশ্রম, দেশে যোগাসাধনা-প্রণালী প্রচার করে বেড়ানোই তাঁর জীবনের ব্রত।

আড্যার থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটীর হেড কোয়ার্টার্সে এসে কয়েকজন সাই-ভক্তের কাছে সত্যসাইবাবার যৌগেশ্চর্যের কথা শোনা মাত্র তাঁর মনে হ'ল এঁকে দর্শন তাঁর করতেই হ'বে এবং

করতে হবে অবিলম্বেই। তখন বিমান যোগে সাইগনে গিয়ে তাঁর যোগ সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেবার কথা, তারপর ফিরবার কথা কালিফোর্নিয়ায় নিজের আশ্রমে। এ সব কার্যসূচী বাতিল করে দিয়ে এলেন তিনি প্রশান্তি নিলয়মে। বাবাকে দেখামাত্র যোগিনী ইন্দিরা দেবী তাঁর পরম ভক্তে পরিণত হ'লেন। ইন্দিরার মুখে তাঁর জীবনের মিশনের কথা শুনে বাবা শূন্যে হাত ঘুরিয়ে ১০৮টা বড় বড় মুক্তোর জপমালা এনে তাই দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

আর একবার বাবা তাঁকে শূন্য থেকে অনেক খুদে খুদে রঙীন পাথর বসানো একটা অঙ্গুরী এনে তাঁকে উপহার দেন। অঙ্গুরীটি ম্যাডামের তেমন পছন্দ হয় নি, এত চাকচিক্য তাঁর মনপূত নয়। তাঁর যা কাজ তাতে এ পরা তাঁর কেমন যেন লাগে, অথচ বাবার আশীর্বাদী জিনিস প্রত্যাখ্যান করাও যায় না। সুতরাং পরলেন তিনি হাতে। একদিন একরাত্রি কেটে গেল। এরপর যা ঘটল তা দেখে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আরও কয়েক জন ভক্তের সঙ্গে বাবা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বাবা আংটিটি নিয়ে তাঁর অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী দিয়ে এমন করে উপরে ধরলেন যে অঙ্গুরীর ক্ষুদে ক্ষুদে রত্নগুলি সবাই স্পষ্ট দেখতে পায়। এরপর বাবা তাতে কয়েকবার ফুঁ দিতেই দেখা গেল ক্ষুদে ক্ষুদে পাথরগুলি আর নেই, আংটিতে একটিমাত্র বড় রকমের হীরে জ্বলজ্বল করছে। বাবা আংটিটা ম্যাডামকে ফিরিয়ে দিলেন। ইন্দিরা দেবী দেখলেন—এ ধরণের আংটি পরতে তাঁর কোন অসুবিধা হবে না, বাবার এ আশীর্বাদী অঙ্গুরী তিনি সব সময়েই পরতে পারবেন।

° ° • •

ডক্টর বি· রামকৃষ্ণ রাও অন্ধ্রের বিশেষ একজন নাম করা লোক। ১৯৫০ থেকে কয়েক বছর তিনি হায়দ্রাবাদের চীফ্ মিনিষ্টার ছিলেন, পরে হয়েছিলেন কেরালা এবং উত্তর প্রদেশের গভর্ণর। সাইবাবার

মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে ইনি তাঁর পরম ভক্ত হয়ে শেষ জীবন প্রশান্ত নিলয়মে বাবার ওখানে কাটিয়ে যান। মৃত্যু হয় তাঁর ১৯৬৭ সালে। মৃত্যুর এক মাস পূর্বে মারফেট তাঁর মুখে বাবার অলৌকিক লীলার কথা কিছু শুনতে চাইলে নিজ মুখে যা বলেছিলেন তাই এখানে বিবৃতি করা গেল।

ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৯৬১ সালে। উত্তর প্রদেশের গভর্ণর তখন তিনি, সস্ত্রীক যাচ্ছিলেন তিনি বম্বে থেকে নৈনিতাল। একটা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় তাঁরা স্বামীস্ত্রী ছাড়া আর কোন আরোহী ছিলেন না।

রাত্রি এগারোটার সময় ডক্টর রাও দেখলেন তাঁদের কামরার বৈদ্যুতিক পাখা থেকে আগুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে। ফুলকি ছড়ানো ক্রমেই বাড়তে লাগল। দেখে মিসেস রাও রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন ঃ কামরায় ত যে কোন মুহূর্তে আগুন ধরে যেতে পারে। বিপদ সঙ্কেত জানিয়ে ট্রেন থামবারও কোন উপায় খুঁজে পেলেন না তাঁরা, কারণ কামরায় না আছে কোন 'বেল, না আছে কোন কর্ড'। বিপদের কথা কেউ জানবার আগেই ত তাঁরা দু'জন পুড়ে মরবেন। আর কোন উপায় না খুঁজে পেয়ে তাঁরা শুধু প্রার্থনা করতে লাগলেন।

এই সময় হঠাৎ শোনা গেল কে যেন বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। আশ্চর্য—খোলা জায়গা দিয়ে দুরন্ত বেগে ট্রেন ছুটে চলেছে, এর মাঝে কি করে কে এসে বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা দেবে? যাই হ'ক পরপর ধাক্কার আওয়াজ শুনে ডক্টর রাও উঠে দরজা খুলে দিলে কামরায় খাকি পোশাকপরা এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রী প্রবেশ করলো। একটিও বাক্য ব্যয় না করে সে বিগড়ে যাওয়া যে ফ্যানটা থেকে অজস্র আগুনের ফুলকি বেরুচ্ছিল তা মেরামত করতে লেগে গেল।

মিনিট পনের পর সে রাও দম্পতিকে বললে, আর কোন ভয়

নেই, এবার আপনারা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়তে পারেন।—এই বলেই লোকটি দরজার কাছে কামরার মেঝের উপরই বসলো।

মিসেস রাও নিদ্রার ভান করে চোখ বুজেও তা কিছুটা খুলে রাখলেন, কারণ তার মনে হচ্ছিল দ্রুত চলন্ত ট্রেনে যে লোক এমনি অনায়াসে উঠে আসতে পারে, কে জানে—সে হয়ত কোন পাকা চোরও হতে পারে, তারা ঘুমুলেই তাঁদের অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে পালাবে! ডক্টর রাওয়ের এমন কোন সন্দেহ না হওয়ায় তিনি একটা বই খুলে পড়তে সুরু করলেন। এরপর হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন ঃ লোকটা তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বলছে, আমি এবার চলে যাচ্ছি, আপনি দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

ডক্টর রাও সবে বলতে যাচ্ছিলেন তাকে পরের ষ্টেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে, কিন্তু তা বলবার আর সুযোগ পেলেন না, তার অগেই লোকটা দরজা খুলে ফেলল, বাইরে থেকে হু হু করে হাওয়া ঢুকতে লাগল, রাও বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে লোকটা কি করে দেখতে দরজার কাছে ছুটে আসতেই দেখেন লোকটা তখন কামরার বাইরের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে। পরক্ষণেই সে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পেলেন না রাও।

অদ্ভুত ব্যাপার ত! ভাবতে লাগলেন ডক্টর রাও ঃ লোকটা টের পেল কি করে যে পাখাটা বিগড়ে গিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে? চলন্ত ট্রেনে লোকটা উঠলই বা কি করে, আবার নেমে গেলই বা কি করে? পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে নামলেই ত চলত? লোকটা বোধ হয় এমন দারুণ ঝুঁকি নিয়ে উঠা নামা করতেই ভালবাসে, আর নয়ত ও পাগল। সে যাই হ'ক কোন অত্যাশ্চর্য শক্তিবলে দূরে কি ঘটছে তা ও নিশ্চয়ই দেখতে পায়, নইলে পাখা বিগড়ে গেছে তা ও জানল কি করে? এই সব ভাবতে ভাবতেই ঘুমানোর জন্যে শুয়ে পড়লেন ডক্টর রাও।

এর মাসখানেক পরে অফিসের কাজে প্লেনে কানপুর থেকে বেনারস আসছিলেন ডক্টর রাও, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং A. D. C.। এঞ্জিনের গোলযোগে প্রাণ হারাতে গিয়ে কোন রকমে বেঁচে গেলেন বাবারই কৃপায়। বাবা অবশ্য তখন বাঙ্গালোরে।

পরের দিন মিসেস রাও বাবাকে ফোনে তাঁর কৃপার জন্য ধন্যবাদ জানাবার সময় তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্তা হ'ল তাতে মিসেস রাওয়ের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ রইল না যে বাবা দূর থেকে তাঁদের বিপদ দেখে নিজেই তা থেকে তাঁদের উদ্ধার করেছেন। প্লেনের কথা শেষ হ'লে বাবা হঠাৎ মিসেস রাওকে বলে বসলেন, ট্রেনে যা ঘটেছিল—কই সে কথার ত কিছু উল্লেখ করলেন না?

ট্রেনের ব্যাপারটা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলেন মিসেস রাও, বললেন, ট্রেনের কি ব্যাপার, স্বামীজি?

কেন, ট্রেনের পাখায় যে আগুন ধরার যোগাড় হয়েছিল, আর আপনার মনে হয়েছিল আমি একজন চোর, এই বলে বাবা হাসতে লাগলেন।

সব কিছু মনে পড়ে গেল। মিসেস রাও বুঝলেন বাবাই দূর থেকে তাঁদের বিপদের কথা জানতে পেরে ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে চলন্ত ট্রেনে উঠে তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে অলৌকিক ভাবে অন্তর্ধান করেছেন।

* • • •

ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন ডক্টর ভি. কে গোকক। সত্য সাইবাবাবা প্রথমে যখন তার বাড়িতে আসেন তখন এসেই দেখেন তাদের বসবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো রয়েছে বেলকুণ্ডির সন্ত শ্রীপান্ত মহারাজের ছবি। সাইবাবা এ সম্বন্ধে উপাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, উনি আমার বাবার গুরু ছিলেন, আমিও ওঁকে খুব ভক্তি করি, তাই ওর মূর্তি ঘরে টাঙিয়ে রেখেছি।

এখানে ওখানে বয়ে নেবার মত ওঁর কোন ছোট ছবি আছে

আপনার কাছে ?

না।

একটা পেলে কেমন হয় ?

খুবই ভাল হয়, স্বামীজি।

এই কথা শোনার পরেই সাইবাবা তার হাতটা উপুড় করে ঘুরাতে লাগলেন,—সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন—আসছেন, তিনি আসছেন। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরানোর পর হাতটা যখন তিনি খুলে উপাচার্যের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। তখন দেখা গেল তার হাতে রয়েছে পান্ত মহারাজের ছবিযুক্ত একটা পেণ্ডন্ট।

অণ্ডাল রঙ্গনায়কী

আড়বার তামিল শব্দ। আড় অর্থে নিমগ্ন, আর বার হচ্ছে যিনি থাকেন। অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেমে যিনি সর্বদা নিমগ্ন থাকেন তিনিই আড়বার বৈষ্ণব। শ্রীবিল্লিপুত্তরের আচার্য বিষ্ণুচিত্ত ছিলেন এই রকম এক আড়বার। অর্চাবতার আদিকেশবের উপাসক তিনি, নিঃসন্তান।

ইষ্টপূজায় মনের সাধে ফুল যোগানোর জন্য নিজের কুটিরপ্রান্তে এক বৃহৎ পুষ্পোদ্যান রচনা করেছিলেন তিনি, পৈতৃক বিষয় আশয় বিক্রি করে, শুধু তাই নয় পাণ্ড্যরাজসভায় দার্শনিকদের সঙ্গে বিচারে ভক্তিমার্গের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করায় জয়মাল্যের সঙ্গে বহু স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন পেয়েছিলেন তিনি—সেগুলিও ব্যায় করে। সুতরাং পুষ্পোদ্যানটি তাঁর শুধু বৃহৎ নয়, সুবৃহৎ।

রোজ ভোরে ইষ্টপূজার জন্য মনের সাধে এ উদ্যান থেকে ফুল তোলেন বিষ্ণুচিত্ত। সেদিন পুষ্পচয়ন হয়ে গেছে, সাজি ভরে উঠেছে

ফুলে, এবার কিছু তুলসীপত্র সংগ্রহের জন্য তুলসীকাননে প্রবেশ করলেন বিষ্ণুচিত্ত। কিন্তু সেখানে যেতেই এক অভাবনীয় দৃশ্য চোখে পড়ল তার : মাটির উপর তুলসীবিছানো শয্যায় শায়িত রয়েছে এক নয়নাভিরাম শিশুকন্যা। এ কি দেবশিশু, না মানবদুহিতা অথবা তার চোখের ভ্রম এ—মায়া ?

এক ফালি চাঁদের মত এই শিশুকন্যাটিকে দেখে পিতৃস্থান কেঁদে উঠেছে নিঃসন্তান বিষ্ণুচিত্তের, দেবকন্যার মত শিশুটিকে বুকে তুলে নিতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু সংস্কারবদ্ধ রক্ষণশীল মন, ওকে স্পর্শ করতে গিয়েও তিনি পারছেন না : জন্ম কার ঘরে—স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য কে জানে ?

বিষ্ণুচিত্তের হৃদয় যখন এই রকম সংশয়দোলায় দুলছে,—কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না, তখন হঠাৎ তুলসী-কুঞ্জের ওপাশ থেকে মধুর কণ্ঠের এক দৈববাণী ভেসে এল কানে : মিছে ভেবে মরছ কেন তুমি ? এ পুষ্পোদ্যান কার ? তুমি কি আমাকেই এটা উৎসর্গ করো নি ? তা হ'লে এ তো আমারই লীলাস্থলী। দেবভোগ্য ছাড়া অবাঞ্ছিত অগ্রহনীয় কোন কিছু কি এখানে আসতে পারে ? যাকে দেখছো তুমি, এ দেবপূজার এক দিব্য অর্ঘ্য। তোমার বাগানের ফুলের মাঝে এ একটা জীবন্ত ফুল। তোমার রচি মালার সঙ্গে একসঙ্গে একেও উৎসর্গ করো তুমি তোমার ইষ্টের চরণে। পালন করো একে নিজের সন্তানরূপে। ভক্তির সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়ে এর জন্ম। কৃষ্ণবল্লভা হয়ে যাপন করবে এ এক দিব্য জীবন।

দৈববাণীতে মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয় এক মুহূর্তে কেটে যায় বিষ্ণু-চিত্তের, কন্যাটিকে বুকে তুলে নিয়ে নিজের কুটিরে এসে পত্নী বীরাজয়কে বলেন, এই দেখ কি এনেছি তোমার জন্যে, প্রভুর উদ্যানের এ এক প্রাণমাতানো ফুল, রঘুনাথজীর কৃপায় স্বর্গ থেকে ঝরে পড়েছে।

নিঃসন্তান বীরাজয় ত আনন্দে কি করবেন দিশে পান না।

একটু পরেই ফুলের সাজি আর নবলব্ধ কন্যা নিয়ে বিষ্ণুচিত্ত মন্দিরে প্রবেশ করে এক সঙ্গে দুইই অর্ঘ্য দিলেন জাগ্রত বিগ্রহের চরণতলে।

মন্দিরে উপস্থিত লোকেরা বিষ্ণুচিত্তকে জিজ্ঞাসা করে, আচার্য, কার কন্যা এ, কোথায় পেলেন, কি করেই বা পেলেন?

ঠাকুর দিয়েছেন, ভাই। এ আমারই।

শুনে চাপা গুঞ্জন ওঠে মন্দির কক্ষে: নিঃসন্তান প্রৌঢ় আচার্যের নিজের সন্তান এ হতে পারে না। জাতি ধর্মের খোঁজ না করে এ কন্যাকে গ্রহণ করা তাঁর মত লোকের কি ঠিক হ'ল?

শুনে মর্মাহত হ'ন আচার্য। যুক্ত করে বিগ্রহের দিকে চেয়ে সকাতরে প্রার্থনা জানান, তোমার দত্ত বস্তুর তুমিই স্বীকৃতি দাও, প্রভু, এর মর্যদা রক্ষা কর।

এরপর ঘটে এক অলৌকিক ব্যাপার: শ্রীবিগ্রহের কণ্ঠ থেকে একগাছা মালতীর মালা ছিড়ে পড়ে বেদীতলে শায়িত কন্যার একেবারে মাথার উপর। উপস্থিত দর্শকদের মাঝে ওঠে আলোড়ন: অর্চাবতারের নিজের নীরব স্বীকৃতি ছাড়া এ আর কিছু হতে পারে না।

০ ০ ০ ০

বিষ্ণুচিত্ত ও বীরাজয় আদর করে কন্যার নাম রাখেন 'কনই' অর্থাৎ কান্তিময়ী কমনীয়া সুকন্যা। পরে সাধিকা জীবনের স্ফূরণ সুরু হ'তেই নাম হয় অণ্ডাল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কন্যার প্রতি টানও আচার্য এবং বীরাজয়ের বড় বেশি বেড়ে ওঠে। শঙ্কিত হ'ন বিষ্ণুচিত্ত। দীর্ঘকাল ভক্তি সাধনার অনুষ্ঠান করে আসছেন তিনি, নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তিনি ইষ্ট ভজনে, ইষ্ট কর্মে। আজ তাঁর জীবনধারা কোনদিকে সঞ্চালিত হতে যাচ্ছে? কেন এই মানবীয় স্নেহের আকর্ষণ, বৃদ্ধ বয়সে কেন এই মায়ার বন্ধন?

এই কথা একদিন গভীর ভাবে ভাবতে গিয়েই কানে এল তাঁর

ইষ্টদেবের স্নিগ্ধ মধুর বাণী : বিষ্ণুচিত্ত, নিজে হাতে গড়া উদ্যানের পুষ্পমাল্যে সারা জীবন তুমি আমায় অর্চনা করে আসছ পরম নিষ্ঠায়। আমারই কৃপায় তোমার পুষ্পোদ্যানে আত্মপ্রকাশ করেছে যে এই দিব্যপুষ্প অণ্ডাল। তাকে তুমি আমারই পূজার উপযোগী করে যত্নে যত্নে প্রস্ফুটিত করে তোল, এই আমি চাই। অণ্ডালকে তুমি দিব্যলোকের একটি ফুল বলে মনে করবে, এ হবে আমারই অর্চনার প্রধান উপচার। তা হ'লে এর প্রতি স্নেহ তোমার আর মায়ার বন্ধন বলে মনে হবে না।

দৈববাণীতে ইষ্টদেবের যে নির্দেশ পান, সেই অনুযায়ী কন্যা অণ্ডালকে পালন করতে থাকেন বিষ্ণুচিত্ত। অণ্ডাল ক্রমে কৈশোরে উপনীত হ'য়। অণ্ডাল একে অসামান্যা জাতরতি তাতে আপ্তকাম। আড়বার পিতা বিষ্ণুচিত্তের শিক্ষাদীক্ষা সাহচর্যে তার হৃদয়-পাত্র বিষ্ণুভক্তি আর কৃষ্ণপ্রেমে কানায়-কানায় ভরে ওঠে। পালক পিতা বিষ্ণুচিত্তের কাছে ভাগবত শুনেছে সে দীর্ঘকাল। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা গোপীরাই তার আদর্শ। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যময় সত্তার চেয়ে মাধুর্যময় রূপটিই তাকে আকর্ষণ করে চুম্বকের মত। কিন্তু গোপীদের পরকীয়া ভাবের চেয়ে নিজের স্বকীয়া ভাবটিই যেন বড় প্রবল হয়ে ওঠে মনে।

বাপের সুবৃহৎ পুষ্পোদ্যান থেকে অজস্র পুষ্প চয়ন করে সে শ্রীরঙ্গ-নাথের জন্য মালা গাঁথে, অর্ঘ্যের ডালা সাজায়। কিন্তু মনোভঙ্গীতে তার বেশ একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। নম্মাড়বারের কৃষ্ণপ্রেমের মত তারও অভীপ্সা ছিল কৃষ্ণকে সুখ দেবার, আনন্দ দেবার, নিজের তৃপ্তি মুক্তি নিজের আনন্দ সেখানে বড় হয়ে উঠত না। কন্যার এ মনোভাবটির কথা বিষ্ণুচিত্তের জানা ছিল না, তাই অণ্ডালের আচরণে একদিন তাঁকে মহা দুর্ভাবনায় পড়তে হ'ল।

সেদিন ভজনকুটিরে বসে শ্রীবিগ্রহের জন্য বাপবেটীতে মালা গেঁথে চলেছেন। বিষ্ণুচিত্ত সেদিন নিপুণ হাতে বহু যত্নে অভিনব

ধরণের এক মালতীর মালা রচনা করলেন। মনে বড় আনন্দ, প্রভুর কণ্ঠে এ মালা আজ কি শোভাই না ধারণ করবে!

হাতের কাজ শেষ করে সাজিটি এক পাশে সরিয়ে রেখে বিষ্ণুচিত্ত অণ্ডালকে বললেন, মা, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসব, তারপর দু'জনে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে সাজাবো।

বাপ ভজনকুটির থেকে চলে যেতেই অণ্ডাল ফুলের মালাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'তে লাগল এই মালায় সজ্জিত হয়ে ঠাকুরকে কি সুন্দরই না দেখাবে! সহসা নিজের বিশিষ্ট ভাবটি এসে গেল মনে। গোপীভাবে বিভাভিত হয়ে, রসাবিষ্ট মনে ভাবতে লাগল সে, কৃষ্ণকে সাজিয়ে আমার অপার আনন্দ, কিন্তু তার চেয়েও যে অনেক বেশি বড় জিনিস হচ্ছে কৃষ্ণের আনন্দ বিধান! আমার এ দেহ ত আমি কৃষ্ণকেই উৎসর্গ করেছি। তা হ'লে এ দেহের রূপসজ্জা, পুষ্পাভরণ ত উৎসারিত করবে প্রাণপ্রিয় প্রভুর তৃপ্তি আর আনন্দ। কৃষ্ণকে উপভোগ করার চেয়ে কৃষ্ণকে উপভোগ করানোর মাঝেই যে রয়েছে মধুর রস সাধনার মূল কথা। ব্রজের গোপীরা মধুর রস সাধনার এই দৃষ্টান্তই ত দেখিয়ে গেছেন!

কৃষ্ণের আনন্দের জন্য নিজেকে সজ্জিত করতে গিয়ে বিষ্ণুচিত্তের গাঁথা মালতীর মালা অণ্ডাল দুলিয়ে দেয় নিজের গলায়। এ মালা যে শ্রীবিগ্রহের জন্য রচিত, ভাবেবেগে ভুল হয়ে যায় সে কথা। এ রকম ভুল তাঁর আজকাল প্রায়ই হচ্ছে। গোপনে প্রভুর জন্য গাঁথা মালায় প্রভুর তৃপ্তি দিতে নিজেই সাজে সে। আজ প্রেমরসের জোয়ার এসেছে মনে, তাই গোপনতা রক্ষা করা আর সম্ভব হ'ল না।

অণ্ডাল নিজের দেহটিকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করে যখন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে,—প্রভুর এতে তৃপ্তি হবে কি না, সেই সময় বিষ্ণুচিত্ত ফিরে এলেন তাঁর ভজন কুটিরে। কিন্তু কি কাণ্ড! অণ্ডাল এ কি করেছে? শ্রীবিগ্রহের জন্য গাঁথা মালা অণ্ডাল নিজের গলায় পরেছে?

কন্যাকে তিরস্কার করে বিষ্ণুচিত্ত আবার উদ্যানে গিয়ে নতুন করে পুষ্প চয়ন করে আবার নতুন মালা গেঁথে বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিলেন, কিন্তু অন্যদিনের মত প্রসন্নতার আভা ত ফুটে উঠল না শ্রীমুখে। শুধু তাই নয় বিগ্রহের কণ্ঠ থেকে আচার্যের দেওয়া মালা ছিঁড়ে পড়ল নীচে। প্রভু ত তা হ'লে তাঁর দেওয়া মালা গ্রহণ করলেন না। বেদনার্ত হৃদয়ে ইষ্টদেবের কাছে কন্যার অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করে বিষ্ণুচিত্ত সবে মন্দির থেকে বাইরে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় দেখেন সামনে তাঁর এক অতি প্রিয়দর্শন শ্যামল কিশোর। কিশোর স্মিতহাস্যে আচার্যকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—কি যেন তাকে বলতে চায়।

আচার্য তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে সরে গেল পাশের এক কক্ষে, তারপর অন্তর্হিত হ'ল এক স্তম্ভের আড়ালে। ঐ স্তম্ভের আড়াল থেকেই এবার মৃদু কণ্ঠের বাণী আসে আচার্যের কানে : বিষ্ণুচিত্ত, তুমি রোজ রোজ আমায় যে মালা পরিয়ে দাও, তা কোথায় ?

প্রভু তোমার জন্য যে সুন্দর মালাটি আজ আমি গেঁথেছিলাম, তা আমার মেয়ে নিজের গলায় পরে করেছে উচ্ছিষ্ট, তাই আবার নতুন করে গেঁথেছিলাম এই মালা।

তোমার মেয়ে ত রোজই অমন করে। তুমি খোঁজ রাখ না, কিন্তু তোমার মেয়ের গলায় পরা মালা পরতেই যে আমার আনন্দ হয় বেশী। তুমি ঐ মালাই আমায় দিও।

ভীত বিষণ্ণ কণ্ঠে বিষ্ণুচিত্ত উত্তর দেন, প্রভু, জেনেশুনে উচ্ছিষ্ট মালা তোমায় আমি কি করে দিই ?

কোন দোষ নেই তাতে, বরং এতেই আমি খুশী হ'ব। তুমি ত জানো না, সে আমার প্রীতির জন্যই নিজেকে অমনি করে সাজায় রোজ আমার মালা দিয়ে, তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকায় আমি তার রূপসজ্জায় আনন্দ পাব কি না জানতে।

আমার শ্রদ্ধার মালা না দিয়ে তোমার কন্যার ঐ প্রেমের মালাই তুমি রোজ আমার জন্য এনো।

ঠাকুরের বাণী শুনে ঠাকুর তাঁর মেয়ের প্রেমে বাঁধা পড়েছেন জেনে ভাবাবেশে বিষ্ণুচিত্তের দুই চোখ দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। অণ্ডালের নায়িকাভাব বটে, কিন্তু সে ভাব হচ্ছে স্বকীয়, কৃষ্ণকে তিনি পতিরূপে ভজনা করতে চান।

• • • •

অণ্ডাল যৌবনে উপনীত হতে বিষ্ণুচিত্ত এবং বীরাজয় একদিন তাঁকে ধরে বললেন, তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে, এবার তুমি মত দাও আমরা উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করি।

অণ্ডাল দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, এ জন্য তোমাদের ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমার পতি আমিই ঠিক করে রেখেছি। পরম প্রভু রঙ্গনাথ ছাড়া আমি আর কাউকে বরণ করব না। কোন মানুষের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না।

কিছুদিন পরের কথা।

রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন অণ্ডাল। প্রভু রঙ্গনাথজী বর সেজে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে, মাথায় রত্নখচিত টোপর, গলায় জুঁই চামেলির মালা, পরণে জমকালো বরের পোশাক। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বিবাহ বাসর আলোয় আলোময়। সঙ্গীরা পরম যত্নে অণ্ডালকে বধূ বেশে সাজাচ্ছে। বিপুল আনন্দের পরিবেশে অণ্ডালের উদ্বাহ সম্পন্ন হয়।

স্বপ্ন এক সময় ভেঙে গেল বটে কিন্তু আনন্দের আবেগে অণ্ডালের সে রাত্রে আর ঘুম এল না। ভোরে শয্যা ত্যাগের পরও দিব্য আনন্দের আবেশই জড়িয়ে রইল তাঁর দেহমনে। স্বপ্নের কথা আর কাউকে বললেন না তিনি।

সন্ধ্যায় বিষ্ণুচিত্ত সবে তাঁর ভজন উপাসনা শেষ করেছেন এমন সময় আশ্রমের বাইরে শোনা গেল এক তুমুল কোলাহল। কি,

কিসের কোলাহল ? এগিয়ে গেলেন বিষ্ণুচিত্ত, চোখে পড়ল এক অভিনব দৃশ্য : প্রভু রঙ্গনাথজীর প্রতীক বিগ্রহকে চতুর্দোলায় চড়িয়ে ভক্তেরা শোভাযাত্রা করে এগিয়ে আসছেন। খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে ঠাকুরকে। আলো আর বাদ্যে চারিদিক সরগরম।

বিষ্ণুচিত্ত অবাক হয়ে ভাবছেন, আজ রঙ্গনাথজীর কোন বিশেষ পূজা বা উৎসব হবে বলে ত শুনি নি! তবে এ কিসের শোভাযাত্রা ? এগিয়ে প্রশ্ন করতেই প্রভুর এক প্রবীণ সেবক উত্তর দিলেন, সে কি আচার্য, আপনি কি এ মহানন্দের সংবাদ শোনেন নি ?

না, ভাই, শুনিনি ত। একবার খুলে বলো ত আমায় শুনি। মনে হচ্ছে প্রভু বিজয়ে বেরিয়েছেন, কিন্তু আজকের উপলক্ষ্যটা কি ?

আপনার বাড়িতেই ত প্রভুর শুভাগমন হচ্ছে। গত রাত্রে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এবং সেবকদের প্রত্যেককেই প্রভু স্বপ্নযোগে জানিয়েছেন আজ তিনি আপনার পালিকা কন্যা অণ্ডালের পাণিগ্রহণ করবেন। আজকের গোধূলিতেই হয়েছে পরম শুভলগ্ন। তাই প্রভুর প্রতীক বিগ্রহ সমারোহে আপনার বাড়িতে আনা হচ্ছে। আপনি এবার সম্প্রদানে ব্রতী হন।

শুনে বিষ্ণুচিত্তের আনন্দের অবধি রইল না। এরপর মহা সমারোহে শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে অণ্ডালের বিবাহ হয়ে গেল। প্রেমময়ী অণ্ডাল তাঁর অভীষ্টদেব রঙ্গনাথজীকে লাভ করলেন প্রাণপতি রূপে। এমন দৃশ্য স্থানীয় নরনারীদের আর কখনও নয়নগোচর হয়নি।

পরের দিন বিষ্ণুচিত্তের অঙ্গনে আনা হ'ল—এক মনোরম চৌদোলা। রম্য বসন-ভূষণে নববধূ বেশে সুসজ্জিতা হয়ে অণ্ডাল পতি সম্ভাষণে চললেন রঙ্গনাথ মন্দিরে। অণ্ডালের দয়িত-মিলনের বহু প্রতীক্ষিত পরম লগ্ন আজ এসে গেছে জীবনে। প্রেমাবেগে

সারা দেহমনে জেগে উঠেছে সাত্ত্বিক প্রেম বিকার।

ভাবোন্মত্তা প্রেমিকা পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে যান রঙ্গনাথ বিগ্রহের দিকে। সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি ওঠে—জয় প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের জয়, জয় শ্রীরঙ্গনাথ নায়কীর জয়। তারই মাঝে অর্ধচেতন অবস্থায় অণ্ডাল এগুতে থাকেন শ্রীবিগ্রহের দিকে। প্রভুর আকর্ষণ যেন দুর্ণিবার ভাবে আকর্ষণ করছে তাঁর প্রেমিকা অণ্ডালকে। প্রমত্তা প্রেমিকা আত্মবিস্মৃত হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারা হয়ে ছুটে যান মন্দিরের গর্ভকক্ষে, মুহূতে ঝাঁপিয়ে পড়েন রঙ্গনাথ বিগ্রহের বক্ষোপরে।

গর্ভকক্ষের সকল দ্বার হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া যায়, নববধূ লোকলোচন থেকে হ'ন অদৃশ্য। ঘটনার অলৌকিকত্বে সমবেত ভক্তমণ্ডলী একেবারে অভিভূত, স্তম্ভিত।

ক্ষণকাল পরে গর্ভকক্ষের দ্বার খুললে দেখা গেল প্রেমসিদ্ধা অণ্ডাল একেবারে লুটিয়ে পড়ে আছেন তাঁর প্রিয়তম রঙ্গনাথ বিগ্রহের বুকে—তাঁকে আলিনবদ্ধ করে। দেহ নিস্পন্দ, প্রাণহীন। মর্ত্যলীলা সমাপ্ত করে কৃষ্ণপ্রেমিকা—প্রবিষ্টা হয়েছেন নিত্যধামে নিত্যলীলায়।

গুরু অঙ্গদ

★ ★ ★ ★ ★ ★

সারা উত্তর ভারত ব্যাপী তখন শিখগুরু নানকের প্রতিষ্ঠা। নানকজীর ভজনসভায় সেদিন এক প্রসিদ্ধ যোগী এসে উপস্থিত। যোগীবরের সঙ্গে নানকজীর বহুদিনের অন্তরঙ্গতা। সাদর সম্বর্ধনার পর যোগীবরকে আসন দেওয়া হ'ল।

কুশল প্রশ্নাদির পর যোগীবর স্মিতহাস্যে বললেন, নানকজী,

আপনার শিষ্য-ভাগ্যের তারিফ না করে পারা যায় না। শত শত মানুষ আত্মিক প্রেরণায় ছুটে আসছে আপনার চরণাশ্রয়ে, আর কি এদের ভক্তিনিষ্ঠা—আর আত্মনিবেদন! দেখলে চোখ জুড়ায়।

শুনে—তা বটে, তা বটে! বলে প্রথমে সায় দিলেন নানক, তারপরেই বললেন, কিন্তু আমি একটা কথা বলি, যোগীবর, ভক্তদের ভাবরসের ফেনাটাই লোকের চোখে পড়ে, আসল বস্তু যে থিতানো রস তা সব আধারে মেলে না, যেখানে মেলে সেখানেও হয়ত তেমন স্বচ্ছও নয়, সুন্দরও নয়।

না, না, আপনার চেলাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, এমন মহাত্মার চেলার অন্তরে ফাঁকি থাকতে পারে না।

প্রসঙ্গ পালটে দিলেন নানক। যোগীবর, অনেকদিন পরে এলেন আমার আশ্রমে, এবার কিছুদিন থেকে আমাদের সেবা গ্রহণ করতে হবে কিন্তু।

বেশ, যেমন অভিরুচি।

পরদিন ভোরে শিকারীর পোশাক পরে যোগীবরের সামনে হাজির হলেন নানক, হাতে শাণিত কৃপাণ, সঙ্গে কয়েকটা শিকারী কুকুর। চেলারা দূর থেকে দেখে বলাবলি করছে, গুরুজীর কি এক খেয়াল চেপেছে মাথায়, রাবির তীরে কোন গহন অরণ্যে তিনি শিকারে যেতে চান কে জানে!

যোগী কৌতূহলী হয়ে নানকের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি হানতেই নানক অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, আজ এক অভিনয়ের জন্তে শিকারীর বেশে সেজেছি। চলুন, আমার সঙ্গে বনে চলুন; সেখানে আপনাকে দেখাব ভক্তদের মাঝে প্রকৃত শরণাগতি আছে ক'জনার।

উৎসুক যোগী মহা উৎসাহ নিয়ে নানকের সঙ্গে চললেন। দর্শনার্থী ভক্তদের সংখ্যা আশ্রমে তখন কম ছিল না, তাঁরা এগিয়ে এলেন গুরুর কাণ্ড দেখতে। অনেক চেলা-গুরুর সঙ্গে যাবার জন্ত

প্রস্তুত হ'লেন।—মহাপ্রেমিক সিদ্ধ পুরুষ সাধারণের মত পশুহত্যা করতে যাচ্ছেন—এটা অনেকের মনঃপুত না হওয়ায় অনেকে সরে পড়লেন।

যাত্রা সুরু করবার আগে নানক তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা দল বেঁধে আমার সঙ্গে চলেছ, এ ভাল কথা। কিন্তু আমার সঙ্গে বনে যাবার এক সর্ত আছে, সেটা পালন করতে হবে সবাইকে। আমার বনভ্রমণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কেউ একটা কানাকড়ি রাখতে পারবে না নিজের সঙ্গে।

সঙ্গের চেলারা সব মেনে নিলেন গুরুর কথা। যোগীবর আর নিজের ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে সুরু হল নানকের পথ চলা।

বনের মাঝে কিছুদূর যাবার পরই দেখা গেল পথের আশেপাশে অজস্র তাম্রমুদ্রা ছড়ানো পড়ে রয়েছে। বিজন অরণ্যে এ কোত্থেকে এল—আশ্চর্যের ব্যাপার!

যোগীর কিন্তু এর তাৎপর্য বুঝতে একটুও বিলম্ব হ'ল না, তিনি অনুচ্চকণ্ঠে নানককে বললেন, বুঝতে পারছি, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এ আপনারাই সিদ্ধাইয়ের খেল, নইলে জনহীন এ জায়গায় এত তাম্রমুদ্রা আসবে কোত্থেকে? কে রাখবে, কেনই বা রাখবে?

শুনে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল নানকের মুখে: এগিয়ে চলুন, আর চুপ করে কি ঘটে তাই লক্ষ্য করে যান।

একটু পরেই দেখা গেল সঙ্গীদের কয়েক জন পিছনে পড়ে নিবিষ্ট মনে সেই মুদ্রাগুলি তুলে নিচ্ছে। ঝুলি ভরতি হবার সঙ্গে সঙ্গে অপরের অলক্ষ্যে তারা দল ছেড়ে চলে গেল।

আরও কিছু দূর এগিয়ে গেলে আর এক বিস্ময়: সেখানে ছড়ানো রয়েছে অজস্র রূপোর টাকা। এগুলি কুড়ানোর জন্য আর এক দল ভক্ত শিষ্য গোপনে হঠাৎ সরে পড়ল। নানক ও যোগীবর পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন।

বাকী সঙ্গীদের নিয়ে নানকজী আরও গভীর বনে প্রবেশ করলো পথের পাশে দেখা গেল থরে থরে সাজানো স্বর্ণমুদ্রা। শিষ্য সেবকদের অনেকেই লুব্ধ না হয়ে পারলে না। গুরু একটু সামনে এগুলেই তারা তাড়াতাড়ি মোহর তুলে তাদের ঝুলি ভরতি করতে থাকে, তারপর সুযোগ মত পিছন ফিরে ছোটে নিজেদের বাড়ির দিকে।

অর্থলোভী সঙ্গীরা নানককে ছেড়ে পালিয়ে গেছে, বাকী রয়েছে কেবল গুটি কয়েক অন্তরঙ্গ শিষ্য। নানক গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তাদের বললেন, প্রভু অলক নিরঞ্জনের অশেষ কৃপা যে তোমরা কেউ অর্থের মোহে পড় নি, কিন্তু সামনে তোমাদের আর এক অগ্নিপরীক্ষা। এবার আমি যা আদেশ করব, নির্বিচারে তা তোমাদের পালন করতে হবে।

এই বলেই নানক তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে চলতে সুরু করলেন। কিছু দূর যাবার পরই দেখা গেল সৎকারের জন্য এক মৃত ব্যক্তিকে আনা হয়েছে বনের মাঝে। শবের আপাদমস্তক শ্বেত শুভ্র বস্ত্রে আবৃত। আনুষ্ঠানিক সব কিছুই আশে পাশে ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু কাছাকাছি কোন লোক দেখা যাচ্ছে না।

শবের কাছাকাছি যেতেই দারুণ দুর্গন্ধ আসতে লাগল নাকে। বোঝা গেল কয়েক দিন আগের শব এখানে কারা রেখে গেছে। ব্যাপার দেখে শিষ্যরা সব বলাবলি করতে লাগল হিংস্র জন্তুর তাড়া খেয়ে দাহকারীর আত্মীয়স্বজনেরা হয়ত পালিয়ে গেছে!

নানক হঠাৎ সেই বস্ত্রাচ্ছাদিত শবদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে আমার আদেশে এই শবের মাংস ভক্ষণ করতে পার?

গুরুর প্রস্তাব শুনে সঙ্গীরা ত একেবারে 'থ': গুরুর মাথা কি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল? নইলে যে পচা শবের গন্ধে ভূত পালায় তার মাংস কেউ কখনো খেতে বলে? তা ছাড়া পচা শবের মাংস খাবার মাঝে আধ্যাত্মিকতাই বা কি থাকতে পারে? গুরুর

কাছে শিষ্যরা এ যাবৎ ভগবৎ প্রেম এবং জগৎ প্রেমের গুণগানই শুনে এসেছেন, এ ধরণের অঘোরপন্থী প্রক্রিয়ার কথা ত কোন দিন শোনেন নি !

নানকের যে সব শিষ্য এযাবৎ নানা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন তারাই এখন তাঁর পাশে ছিলেন, কিন্তু আজ গুরুর এই অভাবনীয় প্রস্তাবের কথা শুনে তারা শুধু মাথা নীচু করে রইলেন।

যোগীবর এবার মুখ খুললেন ঃ নানকজী, আপনার এ আদেশটা কিন্তু বড় কঠোর হয়ে যাচ্ছে। আপনার যে সব একনিষ্ঠ ভক্ত আপনার ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না, এ ন্যক্কারজনক ব্যাপারে তারাও ইতস্তত করবে বই কি।

উত্তরে নানক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, গুরুর জন্য যারা সব করতে রাজী তারাই প্রকৃত শিষ্য। তাদের চিনবার জন্যই আমার আজকের —এ পরীক্ষা। আমার এ আদেশ আর আমি ফিরিয়ে নিতে পারব না, যোগীবর।

একনিষ্ঠ শিষ্য লহিনা অদূরে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে সব কিছু শুনছিলেন, এবার এগিয়ে এসে নানকের চরণে প্রণাম করে যুক্ত করে বললেন, গুরুজী, আপনার এ দীন সেবক আপনার যে কোন আদেশ পালন করতে সর্বদা প্রস্তুত। আমায় বলে দিন শবদেহের কোন অংশটা আমি প্রথমে মুখবিবরে পুরবো ?

শুনে চমকে উঠল সঙ্গীরা সব ঃ লহিনাটা কি শেষে উন্মাদ হয়ে গেল ?

প্রশান্ত মুখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে নানক বললেন, বৎস লহিনা, শবের মধ্যভাগ অর্থাৎ কোমর থেকেই তুমি ভোজন সুরু করো।

লহিনা নির্বিকার চিত্তে তখনই এগিয়ে এলেন শবের কাছে। মুখ নীচু করে বস্ত্রাচ্ছাদিত শবদেহে সবে কামড় বসিয়েছেন এমন সময় হঠাৎ ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক কাণ্ড! দেখা গেল অসহনীয় পূতিগন্ধময় সেই শব কি করে রূপান্তরিত হয়েছে

অতি উপাদেয় ভোজনদ্রব্যে। থরে থরে সাজানো রয়েছে সেখানে ফল আর দুগ্ধজাত ভোজ্য।

নানক এবার লহিনাকে নিকটে ডেকে তাঁর মাথায় হাত দিয়ে মধুর কণ্ঠে বললেন, বৎস, আমার এ কঠিন পরীক্ষায় তুমি সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছ। গুরুর প্রতি এই নিষ্ঠা পৌঁছে দেবে তোমার সেই পরম 'এক'-এর, সেই অলখ নিরঞ্জনের শাশ্বত মহাসত্তায়।

যোগীবর এ দৃশ্য দেখে আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বলে উঠলেন, নানকজী, আপনার এ লহিনার মত শিষ্য কোটিতে গুটিক মাত্র হয়। গুরুর দেহ ও মন এই দুই অঙ্গের সঙ্গেই ঘটেছে তার সাযুজ্য। আপনার পরে মণ্ডলীতে একেই আপনি গুরুর পদে সমাসীন করে যান।

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে নানক বললেন, যোগীবর, আপনার দৃষ্টি অভ্রান্ত, লহিনা আমারই অঙ্গের অংশ—অঙ্গদ। এখন থেকে শিষ্যদের ভবিষ্যৎ গুরু রূপে এ-ই চিহ্নিত হয়ে রইল।

• • • ∘

অঙ্গদ থাকেন খাডুরে। গুরু দর্শনে কর্তারপুর এসেছেন। গুরু নানকজীর দর্শনে এসে ভক্ত-শিষ্যেরা আশ্রমে বেশ কয়েকদিন থেকে যায়। সেদিন আশ্রমে বহু লোকের ভিড়। দর্শনার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা শিষ্যদেরই করতে হয়। তখন বর্ষাকাল, দারুণ দুর্যোগ, রাবি নদী দুই কূল প্লাবিত করেছে। আশ্রমে খাদ্য নেই, সংগ্রহ করবারও কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। পরিচালকেরা নিরুপায় হয়ে নানকের শরণাপন্ন হ'লেন।

ম্যাকলিফ সাহেব তাঁর 'দ্য শিখ রিলিজিয়ন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—গুরু নানক সেদিন তাঁর যোগৈশ্বর্যের এক অদ্ভুত লীলা দেখালেন। ধ্যানাসন থেকে উঠে অন্তরঙ্গ শিষ্যদের নিয়ে তিনি পাশের বাগিচায় ঢুকলেন। সেখানে একটা কীকড় গাছ ছিল। তার কাছে গিয়ে তিনি অঙ্গদকে বললেন, তুমি এই গাছে

উঠে ডালপালাগুলিতে বেশ জোরে কয়েকটা ঝাঁকুনি দাও ত। তোমাদের সবার উপযোগী পর্যাপ্ত উপাদেয় খাদ্য এখান থেকে মিলবে।

শুনে সবাই ত একেবারে অবাক। বাদলের পুত্র শ্রীচাঁদ বলে উঠলেন, কীকড় গাছের ডালপালা কাঁটায় ভরতি, ফল তেঁতো, অখাদ্য, এ গাছ থেকে সুস্বাদু খাবার মিলবে—এমন অদ্ভুত কথা তো কোনদিন শুনি নি।

নানক বললেন, শোন নি এ কথা ঠিক,—কিন্তু আজ তোমরা সবাই চাক্ষুষ দর্শন কর শ্রীভগবানের কৃপায় গুরুজীর অঙ্গদ তোমাদের কি করে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার করে।

গুরুর নির্দেশে অঙ্গদ তখনই সেই কীকড় গাছে উঠে তার ডালে জোরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন,—আর আশ্চর্য—সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি সুস্বাদু ফল আর সুমিষ্ট খাদ্য নীচে পড়তে লাগল।

ভক্তেরা যুক্ত করে এগিয়ে গিয়ে নানকের চরণ বন্দনা করে বললেন, বাবা, আজ আমাদের জীবন ধন্য, আপনার এমন আশ্চর্য যোগৈশ্বর্যের খেলা আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

এজন্য ধন্যবাদ দাও তোমরা ভক্ত অঙ্গদকে।

সে কি বাবা,—এ বিভূতি লীলা ত আপনি নিজেই প্রকটিত করলেন।

লীলা আমার এ কথা ঠিকই, কিন্তু লীলার চিহ্নিত ধারক ও বাহক এগিয়ে না এলে লীলা সম্ভব হয় না। গুরুর আশ্রমে এতগুলি লোক আজ অনাহারে থাকবে এতে গুরুর অমর্যাদা হবে ভেবে অঙ্গদের মনে যে প্রবল আর্তি জেগেছিল শ্রীভগবান তা শুনেছিলেন, তাই আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল এক অমোঘ ঐশী নির্দেশ, তাই এটা সম্ভব হ'ল। তাই বলছি এর জন্য অভিনন্দন জানাও তোমরা অঙ্গদকে, আমাকে নয়।

° ° ° °

কনৌজের কাছে একটা বড় রকমের যুদ্ধে হুমায়ুন শেরশাহের

কাছে হেরে গেছেন, তখনকার কথা। হিন্দুস্থান ছেড়ে যাবেন তিনি এক রকম ঠিক করে ফেলেছেন। লাহোর অঞ্চলে আসার পর কানে গেল তাঁর সিদ্ধপুরুষ গুরু অঙ্গদের কথা। ভাবলেন—ফকীর সাধুসন্তদের সিদ্ধাইর বলে অনেক অসাধ্য সাধিত হয়। গুরু অঙ্গদের অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিতে আমারই বা দোষ কি ?

সাধুর জন্য অনেক ভেট সংগ্রহ করলেন তিনি। তারপর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও একদল দেহরক্ষী নিয়ে অঙ্গদের দরবারে হাজির হ'লেন তিনি। প্রভাতী ভজন সেরে অর্ধনিমীলিতনেত্রে অঙ্গদ তার আসনে উপবিষ্ট। ভক্ত শিষ্যেরা নির্নিমেষ চোখে ভাবাবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রয়েছে গুরুর মুখের দিকে। এমন সময় সম্রাট প্রবেশ করলেন অঙ্গদের আশ্রমে।

শিষ্যেরা গুরুকে নিয়েই ব্যস্ত বলে সম্রাটের উপস্থিতির দিকে কারো দৃষ্টি নেই। ভেট নিয়ে সদলবলে অপেক্ষমান সম্রাট এতে নিজেকে অপমানিত মনে করে ক্রুদ্ধ, বিরক্ত, উত্তেজিত হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠে কোষবদ্ধ তরবারিতে হস্তক্ষেপ করলেন। অঙ্গদ যত বড়ই সাধু হন না কেন, এ উপেক্ষার অপমান সহ্য করতে তিনি রাজী হ'ন। তরবারির ঘায়ে এখনই করবেন তচনচ।

কিন্তু কি আশ্চর্য হুমায়ুনের তলোয়ার খানা কি করে খাপের মধ্যে যেন আটকে গেল। বহু চেষ্টা করেও তা তিনি বের করতে পারলেন না। ভয় পেয়ে গেলেন সম্রাট : সাধুর অলৌকিক সিদ্ধাইয়ের ফল ছাড়া অন্য কিছুতে এ হ'তে পারে না।

অঙ্গদ এতক্ষণে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন। চোখ মেলে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তিনি হুমায়ুনকে বললেন, বুঝলাম, যখনকার যে কর্তব্য তা আপনি করতে পারেন না। শেরশাহকে সায়েস্তা করতে এই অস্ত্র চালনার আপনার প্রয়োজন ছিল, তাতে আপনি সমর্থ হ'ন নি, এসেছেন আপনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি সাধু মহাত্মাদের দরবারে। সেখানে এসে ভক্তি ভরে

তাঁদের সেলাম করবেন, মর্যাদা দেবেন,—এই ছিল আপনার কর্তব্য, তা না করে তলোয়ার হাতে তাদের উপর হামলা করতে চাইছেন আপনি। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মত পালিয়ে এসে বীরত্ব দেখাতে চান আপনি উপাসনারত সাধুদের মেরে। কি লজ্জার কথা।

শুনে অনুতপ্ত সম্রাট ক্ষমা চেয়ে কৃপা ভিক্ষা চাইতে লাগলেন অঙ্গদের। অঙ্গদ শান্ত কণ্ঠে বললেন, নিরস্ত্র সাধুর অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হয়ে এ পাপ যদি আপনি না করতেন, তাহলে অবিলম্বে আপনার রাজ্যের পুনরুদ্ধার হ'ত। দেখতে পাচ্ছি কিছুদিনের জন্য এ রাজ্য আপনাকে ত্যাগ করতে হবে, সহ্য করতে হবে নানা দুঃখ কষ্ট। ভাববেন না, এরপর আপনি আবার আপনার দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পাবেন।

অঙ্গদের এ ভবিষ্যৎ বাণী ফলপ্রসূ হয়েছে। হুমায়ুন এরপর বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে পারস্যে গিয়ে হাজির হ'ন। শাহের সাহায্যে সেখান থেকে রণনিপুণ অশ্বারোহী বাহিনী সংগ্রহ করে তাদের সাহায্যে তাঁর হৃত রাজ্য ফিরে পান।

মীরাবাঈ

★ ★ ★ ★ ★ ★

মীরার কৃষ্ণসাধনায় তাঁর স্বামী ভোজরাজ কোনদিন বাধা সৃষ্টি করেন নি, বরং তাঁর সাধনধারা যাতে অবাধে বয়ে যায় তার সুযোগ করে দিয়েছেন তিনি। বাধা এল স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ বিক্রমজিৎ যখন মেবারের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর কু-শাসন ও অত্যাচারে জনসাধারণই যে শুধু অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়, সদ্যবিধবা অনিন্দ্যসুন্দরী পূর্ণযৌবনা নৃত্যগীতপটীয়সী মীরার প্রতি তাঁর দুরন্ত লালসা জাগল। তাঁকে বশে আনতে সাহায্য চাইলেন

তিনি ভগ্নী উদাবাঈয়ের। উদাবাঈকে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই রাজী হতে হল বিক্রমজিতের অভিলাষ পূরণে সাহায্য করতে।

কিন্তু রাজী হ'লেও উদাবাঈর দ্বারা বিক্রমজিতের পাপেচ্ছা পূরণ সম্ভব হ'ল না। বিক্রমজিতের তাগিদে উদাবাঈ মীরার নিত্যসঙ্গিনী হওয়ায় তার সাহচর্যে উদাবাঈর চরিত্র ধীরে ধীরে পালটে গেল। শুধু যে তাঁর হৃদয় কোমল হয়ে উঠল তাই নয়. মীরার প্রতি, মীরার ইষ্ট-দেবের প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ জেগে উঠল তার চিত্তে।

কিছুদিন অপেক্ষা করবার পর রানা বিক্রমজিৎ গোপনে উদাবাঈর সঙ্গে কথা বলে বুঝলেন তার দ্বারা তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবার নয়, সে নিজেই মীরার সাহচর্যে ভক্তি পথের অনুরাগিনী হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া উদা স্পষ্ট ভাষায় বিক্রমজিৎকে জানিয়ে দিল মীরার মত সতীসাধ্বী মেয়ে জীবন থাকতে কিছুতেই বিক্রমজিতের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। শুনে বিক্রমজিৎ ক্রোধোন্মত্ত হয়ে স্থির করলেন, ধৃষ্টা দুর্বিনীতা মীরার বেঁচে থাকবার অধিকারই তিনি দেবেন না, অচিরে করবেন তাঁর প্রাণনাশ।

দয়ারাম নামে এক বৈশ্য ছিল তখন মেবারের দেওয়ান। লোকটি কুচক্রীই শুধু নয়, যে কোন রকম পাপ কাজ করতে তার বিবেকে বাধে না। তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে রাণা ব্যবস্থা করলেন যে মীরাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হবে : দয়ারাম দেববিগ্রহের চরণামৃতে মিশিয়ে মীরাকে বিষ পান করাবে।

প্রাণঘাতী বিষ সংগ্রহ করে মন্দিরের চরণামৃত পাত্রে তা ঢেলে দিয়ে দয়ারাম মীরার কাছে গিয়ে বিনম্র কণ্ঠে বললে, মা, আজ মহা পুণ্যদিনে কুন্তশ্যামজীর এক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি নিজেই আপনার জন্য প্রচুর চরণামৃত নিয়ে এসেছি। এই নিন সে পরম বস্তু, পান করে ধন্য হ'ন।

পরম আগ্রহে মীরা তা পান করতে যাচ্ছেন এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন সেখানে উদাবাঈ : না, না ও কখনও তুমি পান

করো না, ছুঁড়ে ফেলে দাও পাত্র। ঐ চরণামৃতের সঙ্গে তীব্র বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাণা বিক্রমজিৎ আর দেওয়ান দয়ারামের চক্রান্তের কথা জেনে ফেলেছি আমি। তুমি কিছুতেই ও পান করতে পাবে না।

এদিকে চরণামৃতের পাত্র হাতে পেতেই ভাবাবেশ এসে গেছে মীরার দেহমনে। প্রেমাভিভূত হৃদয়ে তিমি বলে উঠলেন, কি বলছ তুমি উদা, আমার প্রভুর চরণামৃত রয়েছে যে এতে, এ যে আমার পরম বস্তু। প্রেম ভক্তি সাধনার পথের কেউই যে এ মহাবস্তু উপেক্ষা করতে পারে না। তা ছাড়া দয়ারামের অভিসন্ধির কথা ত আমার প্রভু গিরিধারী গোপালের অজানা নেই। তিনি যখন এ বস্তু এখানে পৌঁছুতে দিয়েছেন, তখন এ পান আমি করবই।

উদাবাঈয়ের নিষেধ, মিনতি, আর্তনাদে কর্ণপাত না করে মীরা পরম ভক্তিভরে পাত্রটি মস্তকে ঠেকিয়ে ইষ্টনাম স্মরণ করে অম্লান বদনে সেই তীব্র হলাহল পান করলেন। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে লক্ষ্য করলেন ঐ প্রাণঘাতী বিষ একটুও ক্রিয়া করল না মীরার দেহে। কৃষ্ণময়ী ভক্তিসিদ্ধার মুখ বিবরে প্রবেশ করে তীব্র হলাহল হয়ে উঠল অমৃত।

জনশ্রুতি আছে মীরা যখন ঐ বিষ গ্রহণ করেন তখন দ্বারকায় জাগ্রত বিগ্রহ রণছোড়জীর শ্রীমুখ দিয়ে বার বার ফেনা উদ্গত হয়েছিল। আরাধ্য দেবতা ভক্তদেহের প্রাণঘাতী বিষ আকর্ষণ করে নিয়েছিলেন নিজের প্রতীক দেহে।

তীব্র বিষ গ্রহণের পরও মীরা সুস্থদেহে অচঞ্চল রইলেন—এ অলৌকিক ব্যাপার দেখে দয়ারাম ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে রাণার কাছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করলে। হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে শুনে বিক্রমজিৎ ক্ষেপে গিয়ে মীরার প্রাণ নাশের আর এক উপায় উদ্ভাবন করলেন। নীচেয় বিষধর সাপ রেখে একটি ফুলের ঝুড়ি মীরার ভজন কক্ষে পাঠিয়ে দিলেন। বিক্রমজিৎ জানেন—মীরা ঝুড়ি

ঝুড়ি ফুল সংগ্রহ করেন তার ইষ্টপূজার জন্য। রঙ বেরঙের মালা গাঁথেন তিনি ইষ্টের গলায় পরাবেন বলে, তা ছাড়া প্রাণভরে অঞ্জলি দেন। ফুলের ঝুড়িতে লুকিয়ে কয়েকটা গোখরো সাপ রেখে দিলে সর্পদংশনে মীরার জীবনান্ত হবে নির্ঘাত।

মীরা ঝুড়ি থেকে ফুল নিয়ে মালাও গাঁথলেন, ইষ্টের পায়ে অঞ্জলিও দিলেন, কিন্তু কোন সর্পদংশনে তাঁর বিয়োগ ঘটল না। জনশ্রুতি—আরাধ্য গিরিধারীজীর কৃপাবলে ঝুড়ির সাপ সব পরিণত হয়েছিল সুগন্ধি পুষ্পে এবং তা ছাড়া ঐ ঝুড়ির মাঝে পাওয়া গেল এক পবিত্র শালগ্রাম শিলা।

° ° ° °

বিক্রমজিতের আদেশে মীরাকে এরপর প্রাসাদে বন্দিনীর জীবন যাপন করতে হয়। তাঁর শয়ন কক্ষের বাইরে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা। একদিন গভীর রাত্রে গিরিধারীর কাছে মীরা তাঁর প্রেমার্তি নিবেদন করছেন। আবেগে নানা কথাবার্তা বলছেন তাঁর সঙ্গে।

কোন পরপুরুষ প্রবেশ করেছে মীরার কক্ষে—সন্দেহ করে প্রহরীরা গিয়ে রাণাকে খবর দিলে। খবর পেয়ে রাণা ছুটে এসে দাঁড়ালেন তাঁর ঘরের সামনে। কে আছে তোমার ঘরে, কার সঙ্গে চলছিল তোমার প্রেমালাপ, হাস্য পরিহাস? ঠিক করে বলো?

ও যে আমার গিরিধারী গোপাল। তাঁর সঙ্গে আমি এমনি করেই ত কথা বলি।

চুও রও কুলকলঙ্কিনী—বলে রাণা গর্জে উঠে দরজা ঠেলে মীরার শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে গিয়েই আর্তনাদ করে পিছিয়ে আসেন, তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক সর্বধ্বংসী নৃসিংহ মূর্তি।

নাঙ্গাবাবা

★ ★ ★ ★ ★ ★

নাঙ্গাবাবা পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি পুরীতে কাটিয়ে গেছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাঁর চেহারার কোন পরিবর্তন দেখেন নি। শুধু তাই নয়—১৮৪৯ সালে এক ব্রহ্মবিদ মহাযোগী নাঙ্গাবাবার সাক্ষাৎকারে এসে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীকে বাবার সম্বন্ধে বলেছেন,—এই মহাত্মা অদ্বৈত সাধনার সু-উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। সিদ্ধির যেন এক মৈনাক পর্বত, মৈনাকের মতই আত্মগোপন করে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে যোগীবর বাবার ভক্তদের বললেন, আর তোমরা জেনে রাখ, এই নাঙ্গাবাবার দেহ পাঞ্জাবী, আর ইনিই হচ্ছেন ইতিহাস-খ্যাত মহাবেদান্তী তোতাপুরী মহারাজ, দক্ষিণেশ্বরে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদান্তমতে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

তোতাপুরীজীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণর সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। ভক্তেরা মনে মনে হিসাব করে যোগীবরকে বললেন, তা হ'লে বাবার বয়স এখন দেড়শো বৎসরের মত হ'বে।

যোগীবর বললেন, না আরও বেশি, প্রায় আড়াইশো বৎসর।

এবার নাঙ্গাবাবার যোগৈশ্বর্যের কথায় আসা যা'ক—

নাঙ্গাবাবা থাকেন তখন পুরীর শ্মশানের এক প্রান্তে। উলঙ্গ সুগম্ভীর মহাপুরুষ সারাদিন ধ্যানস্থ থেকে সন্ধ্যার কাছাকাছি এক সের দুধ ও দুটি ডাব আহার্যরূপে গ্রহণ করেন। শ্মশানের কাছেই মধুসূদন গোয়ালার ঘর। সে প্রত্যহ বিকেলে বাবার জন্য এক ভাঁড় দুধ দিয়ে যায় পরম ভক্তিভরেই। সঙ্গে আসে তার বালকপুত্র বংশীধর। বংশীধর আনে বাবার জন্য এক জোড়া গন্ধপুষ্পের মালা।

সে মালা সে সযত্নে বাবার গলায় পরিয়ে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে।

বংশীধর জন্মান্ধ। গরিব হ'লেও মধুসূদন তার ছেলের অন্ধত্ব ঘুচাতে কম চেষ্টা করে নি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। ডাক্তারেরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দৃষ্টিশক্তি লাভ করবার তার কোন সম্ভাবনা নেই।

বংশীধর রোজ বাবার কাছে এসে তাঁকে মালা দিয়ে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলেও বাবা অধিকাংশ সময় নিমীলিত নেত্রে থাকায় তাঁর দৃষ্টি আর বংশীর চোখের দিকে পড়ে না।

মধুসূদন একদিন তার ছেলেকে শিখিয়ে দিলে, বাবাকে তুই তোর দুঃখের কথা বলবি, প্রার্থনা করবি তোর অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দেবার জন্যে, বাবা কৃপা করলেই তুই সকলের মত জগতের সব কিছু দেখতে পাবি।

পরদিন বংশীধর নাঙ্গাবাবাকে মালা দিয়ে প্রণাম করে বাপের শেখানো মত কাতর কণ্ঠে বললে, আমি বড় দুঃখী। জন্মান্ধ আমি, আপনি চোখ মেলে একবার আমার দুর্দশা দেখুন, কৃপা করুন আমায়। আপনি ছাড়া আমার আর কোন ভরসা নেই।

বংশীর কাতর প্রার্থনায় নাঙ্গাবাবা এবার চোখ মেলে চাইলেন তার দিকে। মনের দরজা খোলা ছিল তখন। ক্রন্দনরত বালকের অন্ধ নয়ন দু'টির দিকে চাইতেই করুণায় ভরে গেল তাঁর মন। বাবা স্নিগ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, হাঁরে তুম আঁখ তো খুলো। দেখো, অভিসে তুম অন্ধ আর নেহি, পুরা দৃষ্টি তুমহারা আঁখমে আ গয়া।

তাই তো, তাই তো, হ্যাঁ, বাবা, তাই তো—বলে বিস্ময়ানন্দে চীৎকার করে ওঠে বংশীধর। দুই চোখ দিয়ে তার তখন আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়েছে, দেখছে সে মহাকাশের সীমাহীন বিস্তার, নীল দিগন্তের অপরূপ দৃশ্য আর সাগরোর্মির লীলাচঞ্চল নৃত্য, কণ্ঠে

উচ্চারিত হচ্ছে, কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর এ পৃথিবীর সব কিছু!

আনন্দে বংশী কখনও কাঁদে কখনও হাসে, কখনও দেয় নাঙ্গাবাবার পায়ের নীচে গড়াগড়ি। বাপ মধুসূদন বাবার যোগবিভূতি দেখে স্তম্ভিত, হতবাক্। বাবার দিকে চেয়ে চেয়ে হাতজোড় করে সে শুধু দাঁড়িয়ে রইল, চোখে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার অশ্রু।

নাঙ্গাবাবা একটা বড় গোড়ে বংশীর মাথার উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলেন, হাঁ, হাঁ, আভি তুম ঘর চলা যাও, কা'ল আউর আচ্ছা মালা লে কর আও।

° ° ° °

সমুদ্রতটের প্রবেশ দ্বারের কাছেই বাবার আসন। তীর্থদর্শন বা প্রমোদ-ভ্রমণে যাঁরা পুরীতে আসেন, এই পথে যাতায়াত করতে তাঁদের সবারই নজরে পড়ে এই বিশালকায় জটাজুটধারী উলঙ্গ সন্ন্যাসীর মূর্তি। তাঁরা সবাই প্রায় বাবাকে প্রণাম নিবেদন করে যান।

বাবা নগ্ন অবস্থায় থাকেন বলে এই সময় পুরীর পুলিশ সুপার-ইনটেণ্ডেণ্ট, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক রিপোর্ট দেন। তার বক্তব্য বাবার এই অবস্থায় থাকা বিসদৃশ, রুচিবিগর্হিত এবং আইন বিরুদ্ধ। তাঁকে অবিলম্বে এ স্থান থেকে অপসারণ করাই সমীচীন।

ঘটনা-চক্রে এর কয়েকদিন আগেই ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী বাবাকে দর্শন করতে এসে ভক্তিশ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ফিরে গেছেন। স্থানীয়-লোকমুখে এবং বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকেও ম্যাজিস্ট্রেট নাঙ্গাবাবা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছেন, তাঁদের সবার উক্তিই শ্রদ্ধাপূর্ণ। যা'ক রিপোর্ট যখন এসেছে তখন একবার তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য তিনি মনে করলেন। তিনি এসে দেখলেন বিরাটকায় গৌরকান্তি মহাপুরুষ সর্বত্যাগী মহাদেবের মত উপবিষ্ট। এমন ভাবে আসন করে তিনি বসে আছেন যে দেহের নিম্নাংশের নগ্নতা কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না। চোখদুটির দিকে চাইলে দর্শকের শির আপনা থেকে নত

হয়ে যায়। বাবাকে দেখেই ম্যাজিস্ট্রেট মুগ্ধ হয়ে তাঁর চরণে প্রণত হ'লেন।

বাবা স্নিগ্ধ কণ্ঠে ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন, হমারা মায়ী আপ্‌কা জেনানা তো ইহা আয়ী থী। লেড়কাকা ইম্তেহান থা। উহ্‌ আচ্ছিসে পাশ করে ইসিকে লিয়ে মুঝে বহুত আরজ কী থী। লেড়কা তো বহুত আচ্ছাসে পাশ কিয়া গয়া—না?

ম্যাজিস্ট্রেট যুক্ত করে বললেন, হ্যাঁ বাবা, আপনার আশীর্বাদে সে ভাল ভাবেই পাশ করেছে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্যে এবার তাকে বিলেত পাঠাচ্ছি। সে শীগগিরই এখানে এসে কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে কাটাবে, তারপর তাকে বিলেতের দিকে রওনা করে দেব।

ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে এ কথা শুনবার পর নাঙ্গাবাবা হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেলেন।

ছেলেটি দুই একদিনের মধ্যেই পুরীতে এসে গেল। বাপ-মায়ের কি আনন্দ। বাংলোতে ভোজে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আপ্যায়ন চললো।

পরের দিন ছেলেটিকে নিয়ে তার বাপ-মা নাঙ্গাবাবার কাছে হাজির হ'লেন। বাবাকে প্রণাম করে বাপ সানন্দে বলে উঠলেন, বাবা, এই আমাদের ছেলে, কয়েক দিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে জাহাজে উঠবে, আপনি ওর মাথায় হাত দিয়ে একটু আশীর্বাদ করুন।

বাবা নির্লিপ্ত, উদাসীন, যেন শুনতেই পান নি এঁদের কথা।

ম্যাজিস্টেট এবং তাঁর স্ত্রী ছেলের আশীর্বাদে জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাবা গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, চা'র রোজ বীত্‌ জানে দেও, ইসকে বাদ আও মেরে পাশ।

নাঙ্গাবাবা এ কথা কেন বললেন, বুঝে উঠলেন না ম্যাজিস্টেট এবং তাঁর স্ত্রী, ভাবলেন মহাপুরুষের এ একটা খেয়ালিপনা। তিনজনে বাবাকে প্রণাম করে সেদিনের মত চলে গেলেন।

তিন দিনের দিন রাত্রিবেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ছেলেটি হঠাৎ এক দুশ্চিকিৎস্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

ঘটনাটার কথা অতি অল্পকালের মধ্যেই পুরীর সর্বত্র রটে গেল, জনসাধারণের মধ্যে বাবার নাম প্রচারিত হ'ল।

* * * *

নাঙ্গাবাবা একবার সাগর সঙ্গমে গিয়েছিলেন। পদব্রজে উড়িষ্যায় ফিরবার পথে কলকাতার কাছে রিসড়ায় এসে এক গাছের নীচে আসন বিছালেন। বিশালকায় দিব্যকান্তি শিবকল্প মহাপুরুষ, একবার তাঁর দিকে চাইলে আর চোখ ফেরানো যায় না। স্থানীয় জমিদার লালজী ঐ পথে কোথায় যেতে বাবাকে দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। শ্রদ্ধা ভক্তিতে মন তাঁর ভরে গেল। ভক্তিভরে প্রণাম করে যুক্তকরে তিনি বাবাকে বললেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমাদের অঞ্চলে আপনার পদধূলি পড়ল। যদি এসেই পড়েছেন আমাদের এ অঞ্চলে, তবে চলুন এ গরিবের বাড়িতে, আপনার সেবা করবার সুযোগ পেয়ে আমরা ধন্য হই।

নাঙ্গাবাবা কারো বাড়িতে যেতে চা'ন না, যান না, কিন্তু লালজী পরম আগ্রহ নিয়ে মহাপুরুষ'কে নিজের বাড়িতে নেবার জন্যে এমন ঝুলোঝুলি করতে লাগলেন যে বাবা শেষে লালজীর বাড়ির পাশের বাগিচায় থাকতে রাজী হ'লেন।

রিসড়ায় বেশ কিছুদিন থেকে গেলেন নাঙ্গাবাবা। সপরিবারে লালজী মহাপুরুষের সেবা করে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করতে লাগলেন।

এখানে থাকবার সময় এক দুর্ঘটনার মায় দিয়ে বাবার যোগৈশ্বর্য প্রকাশ পেয়ে গেল।

প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করবার পর অন্যদিনের মত সেদিনও বাবার দর্শনে বের হয়েছেন লালজী। বাড়ির কাছেই এক ঘেঁটু বন। এই জঙ্গলের মাঝে হাঁটা পথ দিয়ে চলতেই পা পড়ল গিয়ে এক

গোখরো সাপের লেজের উপর। ক্রুদ্ধ সাপটি অমনি ফণা উঁচিয়ে লালজীর পায়ে দিলে এক মোক্ষম ছোবল।

যন্ত্রনায় লালজী চীৎকার করে ওঠায় চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হ'ল সেখানে। ওঝা ও ডাক্তারের জন্য চেঁচামেচি সুরু হয়ে গেল। আত্মপরিজনের মাঝে উঠল কান্নার রোল।

লালজী কিন্তু এমন সঙ্কটে পড়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ন নি। দুই বাহু বাড়িয়ে বাবা, বাবা বলতে বলতে ছুটলেন তিনি বাগিচার মাঝে। নাঙ্গাবাবা বসে রয়েছেন সেইখানে। গোখরোর তীব্র বিষ ছড়িয়ে পড়ছে সারা অঙ্গে। কোন মতে বাবার ধুনী আর আসনের কাছে এসেই তিনি ধুপ করে লুটিয়ে প'ড়লেন মাটিতে। সারা শরীর তখন তাঁর নীল হয়ে গিয়েছে, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। চোখ দুটিও ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে উঠল।

বাবার আসনের কাছে লালজীর দেহটি ঘিরে,—জমে উঠল প্রকাণ্ড ভিড়। বাবার মুখে তখন একটি কথা নেই, তাঁর নিষ্পলক দৃষ্টি মুমূর্ষু লালজীর দিকে নিবদ্ধ।

কয়েক মিনিট এমনি করেই কেটে গেল। তারপর বাবা তাঁর কমণ্ডলু থেকে সাগরতীর্থ থেকে আনা পবিত্র বারির কয়েক ফোঁটা সর্পদষ্ট লালজীর চোখে-মুখে ছিটিয়ে দিলেন। একটু পরেই দেখা গেল মৃতকল্প লোকটির দেহে জীবনের লক্ষণ সব ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। দেখতে দেখতে দেহের বর্ণ স্বাভাবিক হয়ে উঠল, সুস্থ মানুষের মত বাহ্যজ্ঞান ও স্বস্তি ফিরে পেলেন লালজী। লালজী প্রায় তখনি উঠে বাবার চরণ ধরে স্তুতি করতে লাগলেন, দুই চোখ দিয়ে দরদর ধারে ঝরে পড়তে লাগল ভক্তি আর কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা। পুলকিত জনতার মুখ থেকে উচ্চারিত হ'তে লাগল,—

জয়, নাঙ্গাবাবার জয়।

বাবা লালজীকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, বেটা, কুছ ডর নেহি। অভি খোরাসে দুধ পী লেও। ঘরমে জা কর বিশরাম

করো। কা'ল সুবহ'সে ফের পাস আ যাও।

পরদিন সকালে লালজী বাবাকে প্রণাম করতে এলেই বাবা তাঁকে বললেন, আজি তো তোমহারা সমঝমে আ গিয়া—জীবন আয়না এক সমান হৈ। তুমহারা ধনদৌলত, ইত্‌নি বড় দোকান, লেড়কা লেড়কী স্ত্রী সব কুছ সমঝকে মায়িক ঝুট হৈ। ইয়ে ইতনা রাখনে সে দু'খকো নিবৃত্তি হোগা, মোক্ষ আ জায়গা তুরন্ত।

*   *   *   *

বাবার আশ্রমে প্রতিদিন ভোরে স্বাধ্যায় উদ্‌যাপিত হয়। সেদিন পঞ্চদশী-পাঠ চলছিল, বাবা মাঝে মাঝে দু'একটি সূত্র ধরে সাধনার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন নতুন দর্শনার্থী এল সেখানে। এসে এক কোণে বসে বাবার মুখের দিকে সে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

পঞ্চদশীর আলোচনা কিছুটা এগুলে বাবা নবাগত লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, দর্শন তো হো গিয়া, আভি চলা যাও।

লোকটা জোড়হাতে বললে, বাবা, আর একটু বসি আপনাকে দর্শন করি।

কিছুক্ষণ পর বাবা আবার লোকটিকে তাগাদা দিলেন, বড়া দুপ হোগী বাহরমে। দর্শন ত হো চুকা, বেকার কাহে বৈঠা রহা? বাবার এমনি তাগাদায় লোকটিকে শেষে উঠে যেতেই হ'ল।

পরে একটি ভক্ত সাহস সঞ্চয় করে বাবাকে বললে, বাবা লোকটির আরও একটু শাস্ত্রালোচনা শুনবার ইচ্ছা ছিল,—আপনি ওকে শুনতে দিলেন না কেন?

বাবা উত্তর দিলেন, তোমারা বালক, এ সবের কি বুঝবে? ওর স্ত্রীর হয়েছে কঠিন রাজযক্ষ্মা। ও কামনা করে বসে ছিল আমি কৃপা করে ওর স্ত্রীর রোগ সারিয়ে দি। কিন্তু আমি তার বাঁচবার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না। আর, কেউ কোন কামনা নিয়ে বসে থাকলে কি শাস্ত্রপাঠ চলে?

নরসিং মেহতা

★ ★ ★ ★

গুজরাটের ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ নরসিং মেহতা। মহাপ্রভু চৈতন্যের উত্তরসূরী তিনি, চৈতন্যবৃক্ষের এক সুরসাল ফল। ডেরা জুনাগড়ে। দিনরাত নামগান আর কীর্তন চলে আঙিনায়। তাঁর ইষ্টদেব পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণই উচ্চনীচ ভেদ, জাতিবৈষম্য হরণ করে নিয়েছেন তার মন থেকে। স্থানীয় দীন দরিদ্র অন্ত্যজরাও তাঁর অঙ্গনে এসে কীর্তনে যোগ দেয়, তিনিও মহাপ্রভুর মতই তাদের প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করে নাম-গানে মত্ত হয়ে নৃত্য করেন।

একদিন একদল দেহাত এসে নিবেদন করলে, প্রভু, রোজ ত আপনার আঙিনায় আনন্দের হাট বসে। আমাদের একান্ত অভিলাষ একদিন আমাদের দেহাত-পাড়ায় আমাদের কুটিরেই হরিসভা বসুক। এতে কি আপনি রাজী হবেন? বড় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছি আমরা।

সে কি রে? এ সব কি বলছিস তোরা? কৃষ্ণসেবায় তোদেরই সব চাইতে বেশি অধিকার, তোদের অর্থের অভিমানও নেই, জাতি-কুলেরও নেই, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা রে!

তবে যাবেন ত, প্রভু?

নিশ্চয় যাব, বারবার যাব।

পরের দিনই নরসিং মহা উৎসাহে দেহাত-পল্লীতে সদলবলে গিয়ে হাজির হলেন। ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মা শত শত অস্পৃশ্য ভক্তদের নিয়ে প্রেমরসে মত্ত হয়ে নব নব পদে কৃষ্ণের স্তুতিগান ও নৃত্য করলেন। দেহাতদের মাঝে ভক্তি প্রেমের এক প্রচণ্ড জোয়ার বয়ে গেল।

কীর্তনের পর বাড়ি ফিরে এলে নরসিঁর রক্ষণশীল জ্ঞাতিরা, নাগর ব্রাহ্মণেরা মারমুখো হয়ে তাঁর আঙিনায় এসে হাজির : ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে, বিশেষ করে নাগর ব্রাহ্মণের কুলে জন্মে এ কি জঘন্য আচরণ তোমার ? নিজের বাড়ির কীর্তন আসরে অস্পৃশ্যদের ডেকে আন, এ অনুচিত হ'লেও এতদিন আমরা তোমায় কিছু বলিনি, মুখ বুজে সহ্য করে এসেছি। এবার কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে তুমি। এ আমরা কিছুতেই চলতে দেব না।

আপনাদের কি হুকুম বলুন।

যে পাপ করেছ তুমি, তার আগে প্রায়শ্চিত্ত কর, তারপর সমাজের সবার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে প্রতিজ্ঞা কর আর তুমি দেহাতদের সঙ্গে মিশবে না।

সে কি করে হয় ? তারা যে আমার হরির আপন জন, হরিজন।

বেশ, তা হ'লে তুমি তাদের নিয়েই থাকো। আজ থেকে নাগর ব্রাহ্মণ সমাজে তোমার আর ঠাঁই রইল না।

এর কিছুদিন পরেই জুনাগড়ের নাগর ব্রাহ্মণ সমাজের এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে বিয়ে। সে বিয়েতে নরসিঁকে আর নিমন্ত্রণ করা হল না। একঘরে লোককে ভোজনে আহ্বান করে কে আবার ফ্যাসাদে পড়বে ?

সাড়ম্বরে বিয়ে হয়ে গেল। এবার ভোজনের পালা। সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা সবাই মিলে পংক্তি ভোজনে বসেছেন। উপাদেয় চর্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয় সব পরিবেশন করা হচ্ছে। মহানন্দে খেতে শুরু করেছেন সবাই, এমন সময়—এ কি অত্যাশ্চর্য দৃশ্য, ভোজন-রত নাগর ব্রাহ্মণেরা সবাই দেখছে তাঁদের প্রত্যেকের পাশে বসে এক একটি অস্পৃশ্য দেহাত। ভোজন পাত্র ত্যাগ করে লজ্জানত মুখে একযোগে উঠে পড়লেন সবাই।

এরপর জল্পনা কল্পনা সুরু হ'ল : এ কি করে হ'ল ? মিথ্যে বলে ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না, সবাই দেখেছে : এতগুলি দেহাত

কোথেকে এল, কি করে এল, আগে ত তাদের দেখা যায়নি!

সমাজের একজন প্রধান তখন চিন্তিত হয়ে সবাইকে বললেন, শোন তোমাদের আমি একটা কথা বলছি: তোমরা যে যাই বলো, আমাদের নরসিঁ মেহতা একজন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, এ যে তারই সিদ্ধাই বলে হতে পারল তা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার প্রতি মহা অন্যায় করা হয়েছে আমাদের।

বেশ ত, এখন কি করা উচিত আমাদের তাই বলো।

চলো সবাই মিলে নরসিঁর কুটিরে গিয়ে আমরা বলি তার উপর বড় অবিচার করেছি আমরা। এজন্য আমরা খুবই অনুতপ্ত। আর বলে আসি আজ থেকে সে আর সমাজচ্যুত নয়। আমাদের সকল কিছু সামাজিক অনুষ্ঠানে সে আগের মতই যোগদান করতে পারবে।

সেদিন থেকেই নরসিঁ মেহতা সসম্মানে নাগর ব্রাহ্মণদের সমাজে আবার গৃহীত হ'লেন।

• • • •

নাগর ব্রাহ্মণদের পংক্তি ভোজনের দিন যে অলৌকিক ব্যাপারটা ঘটে গেল—লোকমুখে তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে জুনাগড়ের রাজা রায় মাণ্ডলিকের কানেও তা গেল।

কৌতূহলী রাজা দূত পাঠিয়ে নরসিঁকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন, নরসিঁ সদলবলে সেখানে গিয়ে তাঁর সদ্যরচিত পদ কীর্তন করে শোনালেন। কীর্তনান্তে মাণ্ডলিক বললেন, ভক্ত কবি, আপনার পদকীর্তন শুনে আমরা সত্যি বড় খুশী হয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে আমার নিজের একটা অনুরোধ আছে সেটা আপনার রাখতেই হবে।

কি অনুরোধ রাজাসাহেব, হুকুম করুন।

আজ আমার জন্মদিন। আমার বড় ইচ্ছা এখানে বসেই দ্বারকাধীশ রণছোড়জীর প্রসাদী মালা পেয়ে আমি ধন্য হই। আপনি

রণছোড়জীর চিহ্নিত সেবক, ভক্তিসিদ্ধ সাধক। আমি চাই এখানে বসেই আপনি এখন আমায় ঐ মালা এনে দিন।

সে কি করে হবে, রাজা সাহেব, আমি রণছোড়জীর একজন অতি দীনহীন ভক্ত, এখানে বসে দ্বারকা থেকে প্রভুর প্রসাদী মালা আনব, সে শক্তি আমার কই ?—করজোড়ে বললেন মেহতা।

শুনে উত্তেজিত মাঙ্গলিক তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠলেন, শুনুন নরসিঁ মেহতা, আমাকে ভুলাতে চেষ্টা করবেন না, আপনার সিদ্ধাইয়ের কথা আমার কানে এসেছে। নাগর ব্রাহ্মণদের বিবাহের ভোজে আপনি যে সিদ্ধাইয়ের খেল দেখিয়েছেন—জুনাগড়ের কারো তা জানতে বাকী নেই। আপনি আমায় এড়াতে চেষ্টা করলে বিপদে পড়বেন। আমি রাজা, আপনি প্রজা, প্রজা হয়ে আমার আদেশ বা অনুরোধ না রাখলে শাস্তি পেতে হয় সে কথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে।

নরসিঁ করজোড়ে বললেন, সত্যি বলছি, রাজাসাহেব, আমার কোন অলৌকিক শক্তি নেই থাকবেই বা কি করে, আমার আশা আকাংক্ষা, শক্তি সামর্থ্য যা কিছু ছিল সব আমি নিবেদন করে দিয়েছি আমার ঠাকুরের চরণে। দ্বারকা থেকে রণছোড়জীর মালা আমি আনব কি করে ?

শুনে রায় মাঙ্গলিক এবার রোষে গর্জে উঠলেন ঃ নরসিঁ মেহতা, রাজ্যের সবাই বলাবলি করে—আপনি ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, অত্যাশ্চর্য বিভূতি আপনার করায়ত্ত। আপনি এই বিভূতি আমায় দেখাতে বাধ্য। আজ রাতের অবশিষ্ট কাল থাকতে হবে আপনাকে কারাগারে। এখানে নিভৃতে বসে আপনি চেষ্টা করুন রণছোড়জীর প্রসাদী মালা আনতে ! এ মালা আমার চাই-ই চাই। না পেলে আমার আদেশে কা'ল প্রভাতে হবে আপনার প্রাণদণ্ড।

রাজসভা কেঁপে উঠল মাঙ্গলিকের এ দৃপ্ত ঘোষণা শুনে। রাজার আদেশে রক্ষীরা নরসিঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখলে পাশের

বন্দীশালায়। কক্ষের লৌহ-কপাট সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

প্রাণের ভয় নেই নরসিঁয়ের। কারাকক্ষের দ্বার রুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্মিতহাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখেঃ কারা-প্রাচীরের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিয়ে ভালই করলে, প্রভু। আশে পাশে কেউ আর রইল না, এবার তোমার দীনভক্ত নির্জন কক্ষে সারা মন প্রাণ দিয়ে তোমাকেই স্মরণ করতে পারবে। করুণাঘন মূর্তিতে আবির্ভূত হও তুমি, মুখোমুখি থাকব আমরা দুজনে, আমি নরসিঁ—আর নরসিঁ-এর প্রভু। তবে প্রভু, একটা প্রার্থনা তোমায় না জানিয়ে পারছি না। তোমার ইচ্ছায় রাজ্যের সবাই জেনে গেছে নরসিঁ তোমার কৃপাসিদ্ধ ভক্ত। রাজা মাঙ্গলিকের কাছে ভক্ত নরসিঁর মান রক্ষা করে তোমার শরণাগতি-তত্ত্বের জয় ঘোষণা কর, প্রভু।

ভোর হ'লে রাজা মাঙ্গলিক তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কারাকক্ষের সামনে এসে হাজির হ'লেন। চারদিকে ভক্ত ও কৌতূহলী নর-নারীর ভিড়। কারাকক্ষের দ্বার খোলা হ'লেই দেখা গেল নরসিঁ মেহতা ভাবাবেশে ঠাকুরের নাম নিয়ে উন্মত্তের মত নর্তন করছেন, আর এ কি—দুই হাতে রয়েছে যে তাঁর রণছোড়জীর দুটি সুবৃহৎ মালা।

রাজপুরোহিতেরা আনন্দে অধীর হয়ে বলে উঠলেন, এইতো এসে গেছে রণছোড়জীর প্রসাদী মালা। জয় প্রভু রণছোড়জীর জয়; জয় ভক্ত নরসিঁ মেহতার জয়।

° ° ° °

কিছুদিন পরের কথা। জুনাগড়ের এক প্রসিদ্ধ বণিক হন্তদন্ত হয়ে নরসিঁ মেহতার কুটীরে এসে হাজিরঃ মেহতাজী, একটা বড় মুস্কিলে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। এ সংকট থেকে উদ্ধার আমায় আপনাকে করতেই হ'বে।

আমার কি শক্তি, ভাই, দীনহীন নর আমি, সংকটত্রাতা আমার ঠাকুর। তা আপনার এ চাঞ্চল্যের কারণ কি বলুন ত?

বলছি, তাই, সব খুলেই বলছি। সেই দ্বারকার বন্দরে এক নাম করা শেঠ আমার কাছে কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাবেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই তা দিতে হবে আমায়। বেট-দ্বারকায় যাবার পথে এখন যা যুদ্ধ বিগ্রহ চলেছে তাতে অতগুলি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যাওয়া আমার ঠিক হবে না। আমি চাই ঐ অর্থ আমি এখানকার কারো তহবিলে জমা দিই, আর দ্বারকায় পৌঁছে ওখানকার তাঁর কোন প্রতিনিধির কাছ থেকে তা আমি নিয়ে নি।

তা আমি আপনাকে এ কাজে কি সাহায্য করতে পারি—জিজ্ঞাসা করলেন নরসিঁ।

আমি যা চাইছি, ইচ্ছা করলে আপনিই কেবল তা করে দিতে পারেন, আর কারো সাধ্য নেই।

বুঝলাম না কথাটা, একটু খোলসা করে বলুন।

বলছি, খোলসা করেই বলছি : সবাই জানে—দ্বারকাধীশ আপনার পরম সুহৃদ, তাঁর কাছে আপনার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে না। ঠিক বলছি কি না—আপনিই বলুন ?

স্মিত হাস্যে নরসিঁ উত্তর দেন, তা এ কথা মিথ্যে বলি কি করে, তিনি আমার প্রাণপ্রভু, প্রাণের বন্ধু, এতে আর সন্দেহ কি ?

আপনি স্বীকার করলেন যখন, তখন কাজটা আমার সহজ হয়ে গেল। আমি বলছি কি—জানেন, আপনার কাছে আমি পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা জমা করে দিচ্ছি, আপনি শুধু একটা চিরকুটে লিখে দিন যে আমি দ্বারকায় পৌঁছলেই আপনার বন্ধু দ্বারকাধীশ আমায় ঐ পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা আমায় দিয়ে দেবেন। এ না হ'লে আমার ব্যবসা কিন্তু একেবারে লাটে উঠবে—আগে থাকতেই বলে রাখছি।

বণিকের প্রস্তাব শুনে নারসিঁ একেবারে 'থ'। জগৎস্রষ্টা জগৎপতিকে শেষটায় কিনা এক বেনিয়ার সঙ্গে হাত-চিঠি মারফৎ অর্থের লেনদেন করতে হবে।

বেনিয়া কিন্তু নরসিঁকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে জোড় হাতে বললে, মেহতাজী, এ ব্যবস্থা আপনার করতেই হবে। আমি আপনার শরণ নিচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কিষণজী আপনার মর্যাদার খাতিরেই আমার এ অনুরোধ রক্ষা করবেন।

নরসিঁ উত্তরে কিছু বলার আগেই বণিক তার স্বর্ণমুদ্রার থলিটি তাঁর হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুতপদে দ্বারকার দিকে রওনা হয়ে গেল।

শোনা যায় বনিক দ্বারকায় পৌঁছতে না পৌঁছতে এক শ্যামল কিশোর ব্যস্তসমস্ত ভাবে দেখা করে বললেন, ভাই আপনি কি আমাদের নরসিঁর বন্ধু, স্বর্ণমুদ্রার থলিটির জন্য অপেক্ষা করছেন? এই নিন, নরসিঁর কাছে যা রেখেছিলেন তার সবটাই ঠিক মত রয়েছে এই থলিতে। থলি দিয়েই শ্যামল কিশোর কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

যশোদা মাঈ

★ ★ ★ ★ ★ ★

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। উত্তর ভারতের নানা স্থান পরিব্রাজন করে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন গাজীপুরে, উঠেছেন বাল্যবন্ধু সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। ইচ্ছা এখানে কিছুদিন থেকে পওহারী বাবাকে দর্শন করবেন, তাঁর সঙ্গলাভ করবেন।

প্রবাসী বাঙালী গগনচন্দ্র রায় এখানকার এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। ধর্মপ্রাণ, কৃষ্টিবান, খ্যাতিমান, পওহারী বাবার একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তও বটে। স্বামীজী আসার খবর পেয়ে পরম আগ্রহে তাঁকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে আনলেন গগনচন্দ্র। স্বামীজীর অগ্নিগর্ভ বাণী এবং

অধ্যাত্মসংগীত শোনবার জন্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হ'ল গগনবাবুর বাড়িতে।

হঠাৎ এক সময় স্বামীর নজর পড়ল রায় মশায়ের নয় বৎসর বয়স্কা কন্যার দিকে। ফুট ফুটে রং, সারা অঙ্গে লাবণ্যশ্রী, আয়ত নয়ন দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন স্বামীজী বালিকার দিকে।

গগনবাবু তা লক্ষ্য করে পরম উৎসাহে বলে উঠলেন, স্বামীজী, এটি আমারই মেয়ে,নাম মণিকা। আপনি একে আশীর্বাদ করুন।

আপনার এ মেয়েকে আশীর্বাদ আমি অনেক আগেই করেছি। এবার আমি একে পূজা করব—মাতৃরূপে।

স্বামীজীর মুখে দিব্য স্নিগ্ধ হাসি।

স্বামীজীর কথা শুনে চমকে ওঠেন গগনচন্দ্র : একি অদ্ভুত কথা শ্রদ্ধেয় সন্নাসীর অতিথির মুখে।

স্বামীজী মধুর কণ্ঠে বলেন, বড় শুদ্ধসত্ত্ব আপনার এ কন্যা। একে দেখার পরই আমার সংকল্প জেগেছে, দেবী জগন্মাতাজ্ঞানে একে আমি অর্চনা করব, আপনারা আমার জন্যে এটুকু কষ্ট স্বীকার করে কুমারীপূজার আয়োজন করে দিন।

পরদিন কুমারীপূজার অনুষ্ঠান হ'ল রায়ের ভবনে। স্বামীজী জগন্মাতার আরাধনা শেষ করে নিমজ্জিত হ'লেন ধ্যানের গভীরে। ধ্যান থেকে উঠবার পর তাঁর শ্রীমুখ থেকে প্রথম কথা বেরুল, এ মেয়ে সামান্য মানবী নয়, পূর্বজন্মের বিপুল সাত্ত্বিক সংস্কার নিয়ে এ জন্মেছে।

স্বামীজীর বাণী বিফল হয় নি গগনচন্দ্রের কন্যার জীবনে। তাঁর এই কন্যা মণিকাই যথাকালে অসামান্য বৈষ্ণব সাধিকা যশোদা-মাঈ নামে আত্মপ্রকাশ করেন।

• • • •

ব্রিটিশ যুবক রোনল্ড নিকসন যশোদামাঈর কৃপা পেয়ে কি করে

কৃষ্ণ প্রেমিক হ'লেন, ভক্তিসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাপুরুষে রূপান্তরিত হ'লেন, তার গোড়ার ব্যাপার শুধু বিস্ময় নয়, রীতিমত অলৌকিক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলেছে তখন। অন্যান্য দেশ-প্রেমিকদের মতো ব্রিটিশ তরুন রোনল্ড নিকসনও কলেজের পড়া ছেড়ে সামরিক বাহিনীতে পাইলটের শিক্ষা নিয়ে রয়াল এয়ার ফোর্সে যোগ দিলেন।

এই সময় একদিনের এক দৈব ঘটনা তাঁর জীবনে আনলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জার্মানীর উপর বোমা বর্ষণের জন্য বম্বার প্লেনের কক্‌পিটে বসে উড়ে চলছেন নিনি। হঠাৎ কেমন এক অলৌকিক ভাবের আবেশে আবিষ্ট হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন তিনি, যখন চেতনা ফিরে পেলেন তখন দেখেন ব্রিটিশ এরোড্রোমে কি করে ফিরে এসেছেন তিনি। সঙ্গীরা বললে, আজ মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসেছ তুমি। জার্মান জঙ্গী বিমানগুলো ওঁং পেতে ছিল, অনেক বম্বারকে কাৎ করেছে তারা। তুমি কি করে যে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে, আশ্চর্য।

নিকসনের বিশ্বাস তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন, প্লেনকে নিরাপদ জায়গায় এনে দিয়েছে তাঁর রক্ষাকারী দৈবশক্তি। পরম প্রভু ঈশ্বরই তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে সরিয়ে এনেছেন।

জীবনের মোড় এবার ঘুরে গেল তাঁর। এখন থেকে অধ্যাত্ম-সাহিত্য এবং অধ্যাত্মচিন্তাই হ'ল তার জীবনের উপজীব্য। পূর্ব জীবনের এক সুপ্ত সংস্কার বশে বার বার মনে পড়তে লাগল ভারতবর্ষের কথা, ভারতীয় সাধনা ও সাধুসন্তদের কথা। স্থির করলেন ভারতবর্ষে গিয়েই বসবাস করবেন, অনুসরণ করবেন ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ধারা। মনে প্রবল ইচ্ছা জাগলে উপায়ও একটা মিলে যায়। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লখ্‌নৌয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইংলণ্ডে এলেন। নিকসন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অধ্যাপকের কাজ নিয়ে এলেন

ভারতে, লখনৌ শহরে। এখানে এসেই লাভ করলেন যশোদামাঈর পবিত্র সান্নিধ্য ও তাঁর স্নেহ।

যশোদামাঈর গার্হস্থ্য জীবনের নাম মণিকা দেবী। ভাইস্‌চান্সেলার জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহধর্মিনী ইনি। নিকসন প্রথম যখন এঁর সংস্পর্শে আসেন তখন এঁর মাঝে ছিল দৈবসত্তা। তাঁর এই দৈবসত্তা সম্বন্ধে ভক্ত সাধক সুরশিল্পী দিলীপ কুমার রায় নিকসনকে বলেছেন,— 'যখন এঁকে দেখি পার্টিতে, সামাজিক উৎসবে হাসি আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছেন, সিগারেট খাচ্ছেন, রসিকতা ও রঙ্গ রসে মাতিয়ে তুলছেন, সবাইর মুগ্ধ দৃষ্টি ঘিরে আছে শুধু এঁকেই, সব কিছুর মধ্যমণি ইনিই। আবার যখন কৃষ্ণ কথা নিয়ে ভজন সুরু করি তখন দেখি অন্যতর রূপ, ভাবাবেশে কেঁদে ভাসাচ্ছেন, এ যেন আর একটি নতুন মানুষ। এক এক সময়ে আমার মনে হয়, ইনি সত্যিই এক ভিন্ন জগতের লোক, আত্মার গভীরে নিভৃতে বিচরণ করছেন এই প্রচ্ছন্ন সাধিকা'।

অভিজাত মহলের লক্ষীরাণী মণিকা দেবীর সাধিকা রূপটিই তাঁর আসল রূপ। এটা নিকসন বেশ ভাল করে বুঝেছেন। তাই নিকসন দিলীপকুমারের পিঠ চাপড়ে বললেন, তোমার এ কথায় আমি খুশী হ'লাম, দিলীপ। অন্য লোকের মত তুমি ওর বাইরের দিকটা দেখে সিদ্ধান্ত নাও নি। ওকে ধরা, ওর মূল্যায়ন করা মোটেই সহজ নয়।

দুইজনের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হলে নিকসন মণিকা দেবীকে ডাকেন, মা, আর মণিকা ডাকেন নিকসনকে গোপাল বলে।

নিকসন হঠাৎ একদিন মণিকা দেবীকে ধরে বসলেন, মা, আমি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নেব, আর সন্ন্যাস নেব, আর সে দীক্ষা এবং সন্ন্যাস তোমার কাছ থেকেই নেব।

কি করে হয়, বাবা, আমি নিজে সন্ন্যাস নিই নি,—দীক্ষা ও সন্ন্যাস যদি নিতান্তই নিতে চাও তা হ'লে বৃন্দাবনের কোন

বৈষ্ণবাচার্যের কাছ থেকে নিয়ে এস।

নিকসন তাতে রাজী ন'ন। বললেন, মা, তোমার কাছেই পেয়েছি আমি পরম পথের সন্ধান, পেয়েছি কৃষ্ণপ্রেম-রসের স্বাদ। দীক্ষা ও সন্ন্যাস নিতে হ'লে তোমার কাছ থেকেই নেব, আর কারো কাছ থেকে নয়।

সমস্যায় পড়লেন মণিকা দেবী, নির্দেশ প্রার্থনা করলেন কৃষ্ণশক্তি শ্রীশ্রীরাধারাণীর কাছে। দিব্যদর্শনের মাঝ দিয়ে প্রিয়াজীর প্রত্যাদেশ মিলল সেদিন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যশোদা মাঈ। নিকসনকে ডেকে বললেন, গোপাল, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে : রাধারাণীর অনুমতি পেয়েছি আমি। দীক্ষা ও সন্ন্যাস তোমায় আমি দেব। কিন্তু কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে তোমায়। বৃন্দাবনে গিয়ে নিজে আমি আগে সন্ন্যাস নেব, তারপর তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

তাই হল। কিছুদিন পর বৃন্দাবনে গিয়ে মহাত্মা বালকৃষ্ণ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে বৈষ্ণবীর সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন মণিকা দেবী, নাম হল তাঁর যশোদা মাঈ। ফিরে এসে নিকসনকে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দান করলেন। নব নামকরণ হ'ল তাঁর কৃষ্ণপ্রেম।

সন্ন্যাস নেবার পর যশোদা মাঈ চলে আসেন হিমালয়ের ক্রোড়ে মের্তোলায়—আলমোড়া থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। মের্তোলার নূতন নামকরণ হয়—উত্তর বৃন্দাবন, যশোদা মাঈ স্থাপন করলেন এখানে শ্রীরাধারাণী এবং শ্রীরাধারমণের যুগল বিগ্রহ।

• • • •

বিখ্যাত সাধক ও সংগীতশিল্পী দিলীপ কুমার রায় এসেছেন সেবার মের্তোলার আশ্রমে। পূজার শেষে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহের সামনে তাঁর ভজন গান সুরু হ'ল। যশোদা মাঈ তখন রীতিমত অসুস্থ, পাশের কামরায় শয্যায় শায়িত। দিলীপ কুমারের ভজনের

বাণী ও সুর হৃদয়ে জেগে উঠল তাঁর কৃষ্ণপ্রেমের আর্তি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল এক অলৌকিক দর্শন। দেখলেন ভজনকক্ষে দিলীপ কুমারের পিছনে প্রসন্নমধুর মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, একমনে শুনছেন তাঁর দরদী কণ্ঠের মধুর ভজন।

দিব্য আনন্দের উদ্দীপনায় দিশেহারা হয়ে উঠলেন যশোদা মাঈ। চলচ্ছক্তিহীনা রোগীনী হয়েও অবলীলায় এসে হাজির হ'লেন শ্রীমন্দিরে, ইষ্ট বিগ্রহের সম্মুখে হ'লেন ধ্যানস্থ।

কিছুক্ষণ পরে সেবকেরা যশোদা মাঈর শোবার ঘরে গিয়ে দেখেন তিনি শয্যায় নেই, কোথায় গেলেন তিনি অমন রুগ্ন দেহ নিয়ে! গেলেনই বা কি করে ?

তখনই খোঁজাখুঁজি সুরু হয়ে গেল। পাওয়া গেল তাঁকে শ্রীমন্দিরে। চোখমুখ থেকে পীড়ার ভাব কেটে গেছে, ফুটে উঠেছে সেখনে দিব্য আনন্দ এবং এবং জ্যোতির আভা।

কিছু পরে যশোদা মাঈ স্নিগ্ধ মধুর হেসে দিলীপ কুমারকে বললেন, দিলীপ, তোমারা কেউ দেখ নি, কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখলাম আমার লীলাময় আজ তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে তোমার ভজন শুনছিলেন।

যশোদা মাঈর তপস্যায় জাগ্রত মের্তোলার শ্রীবিগ্রহ। এই বিগ্রহের লীলার অলৌকিক প্রকাশ শুধু যশোদা মাঈর জীবনেই নয়, ঘটেছে তাঁর অনেক উত্তরসাধকদের জীবনেও—বারবার।

হরিহর বাবা

★ ★ ★ ★ ★ ★

বিশ্বনাথ বাবা ছিলেন হরিহর বাবার স্নেহধন্য এক অন্তরঙ্গ শিষ্য। এই বাঙালী সাধক একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বৎসর তাঁর গুরুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং এবং সেবা করেছেন।

গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরম পড়েছে কাশীতে। গ্রীষ্মদাহে অস্থির হয়ে উঠেছে বারাণসীর নরনারী। হরিহর বাবা তখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে অসিঘাটে এক বজরায় থাকেন। সন্ধ্যার পূজা আরতি শেষ হয়ে গেলে বিশ্বনাথ বাবা তাঁর গুরু মহারজকে বললেন, বাবা, আজ বড় লু'র দাপট গেছে, আপনার শরীরটাও তেমন ভাল যাচ্ছে না, অনুমতি দিন আপনাকে একটু গঙ্গাবক্ষে ঘুরিয়ে আনি।

বলতেই অনুমতি মিলে গেল বাবার। কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত সংগে নিয়ে সুরু হ'ল বাবার নৌ-বিহার। গঙ্গায় কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর দেখা গেল আকাশের কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ। এখনই হয়ত ঝড়ের তাণ্ডব সুরু হয়ে যাবে। হল'ও তাই। দেখতে না দেখতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল।

বিশ্বনাথ বাবা মনে মনে প্রমাদ গণলেন : তাইত, গুরু মহারাজ ত নিজে নৌবিহারে বেরুতে চাননি, তিনি নিজে তাঁকে এনে শেষে এই বিপদে ফেললেন!

তখনই তিনি মাঝিদের ডেকে বললেন এক্ষুনি তোমরা পাল গুটিয়ে ফেল। হুঁশিয়ার হও, ঝড়ের ঝাপটায় বজরা যেন উল্টে না যায়।

হরিহর বাবা ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বজরার ভিতর বসে ছিলেন, শিষ্যকে ঘাবড়াতে দেখে প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, বেটা, অযথা ভয়

মরছ কেন? আমি যেখানে আসন করে বসে আছি রাম নামের দিব্য শক্তিতে ঘেরা সে স্থান, সেখানে নৈসর্গিক উৎপাত কি করবে? কোন ভয় নেই তোমাদের। যে ঝড় এগিয়ে আসছে তা আমাদের এই বজরার আশ্রমকে এড়িয়ে যাবে। আমাদের কোন ক্ষতিই তা করবে না।

সত্যিই তাই হ'ল। বিশ্বনাথ বাবা সবিস্ময়ে দেখলেন, প্রচণ্ড ঝড় ঐরাবতের মত গর্জন করতে করতে ছুটে এসে কি এক যাদুমন্ত্র-বলে বজরার পাশ কাটিয়ে বয়ে যেতে লাগল। হরিহর বাবা তখন স্থানুর মত নিশ্চল, নীরব, ধ্যানমগ্ন! প্রাকৃতিক দুর্বিপাক রোধের যে অদ্ভুত ক্ষমতা সেদিন হরিহর বাবা দেখিয়েছিলেন তার স্মৃতি সুদীর্ঘকাল বিশ্বনাথ বাবার মানসপটে মুদ্রিত ছিল।

০ • ০ ০

প্রত্যক্ষদর্শী অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের কাছ থেকে হরিহর বাবার যোগবিভূতির অনেক বিবরণই পাওয়া যায়—

তখন হরিহর বাবা কাশীর উপকণ্ঠে বীতরাগ বাবার সাধন কুটিরে অবস্থান করছিলেন। প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠে গঙ্গাস্নান করে বাবা জপধ্যানে নিমগ্ন হ'ন। একদিন স্নান করবার সময় এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ভাবতন্ময় অবস্থায় স্নান করে উঠতে গিয়ে পা পিছলিয়ে পড়লেন তিনি এক নাগফণি কাঁটার ঝোপে। সঙ্গীরা ছুটে এসে তাঁকে ঝোপ থেকে তুলে সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

কিছুটা সুস্থ হবার পর তিনি শুনলেন, কিছুদিন আগেও বীতরাগ বাবাও নদীতীরের এই কাঁটাগাছে আহত হয়েছেন। বেশ কিছুটা রক্তপাতও নাকি হয়েছে তাঁর। এই কথা শুনে হরিহর বাবা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন—শোন তোমরা, যে নাগফণি গাছ বীতরাগ বাবার মত মহাপুরুষের রক্তপাত ঘটায় কাশীর গঙ্গাতীরে তার থাকবার কোন অধিকার নেই। ঐ কাঁটা গাছ এখন থেকে যেন আর গঙ্গাতীরে না দেখা যায়।

বাক্‌সিদ্ধ সাধকের বাক্য ব্যর্থ হয় নি। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল কাশীর গঙ্গাতীরে নাগফণি গাছ আর জন্মাচ্ছে না।

*   *   *   *

কয়েক বৎসর পরের কথা। হরিহর বাবা তখন তুলসী ঘটে থাকেন। একদিন গভীর রাত্রে—সাধন ভজন সেরে বাবা এক গাছের নীচে আসন পেতে শুয়ে ঘুমিয়েছেন, এমন সময় নারী কণ্ঠের এক আর্ত চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঐ মহল্লার এক বৃদ্ধা ভক্ত প্রায়ই এসে বাবাকে প্রণাম করে যেত, সেই আজ বাবার আসনের সামনে এসে কেঁদে আছড়ে পড়ে কাতর কণ্ঠে বলছে, বাবা বড় বিপদে পড়েই এসেছি এই অসময়ে আপনার কাছে। আপনার কৃপা ছাড়া উদ্ধারের কোন উপায়ই নেই।

কেন, কি হ'ল খুলে বল।

বাবা, আমার ছেলে কলকাতায় থাকে। এইমাত্র সেখান থেকে তার এল, সে সেখানে কলেরায় মর মর। বাবা আমি বিধবা, বড় গরিব। এই ছেলে ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আপনি দয়া করে তার প্রাণ ভিক্ষা দিন।

তা তুমি এত উতলা হচ্ছ কেন, মায়ী, রাম নাম জপ কর, রাম নাম সর্ববিঘ্নহর, এতেই তোমার সব বিপদ কেটে যাবে; শান্তকণ্ঠে বললেন হরিহর বাবা।

আমার মুখের রাম নামে কোন কাজ হবে না, বাবা, বিপদে পড়লেই ত রাম নাম করি; বিপদ ত আমার তাতে কাটে না। আপনি নিজে আমায় কোন ওষুধ দিন, তাই নিয়ে আমি আজই কলকাতা রওনা হ'ব।

বাবার কোন সান্ত্বনা, কোন আশ্বাসই স্ত্রী লোকটি শুনতে চায় না, সে কেবলি কাঁদে আর যুক্তকরে বারবার মিনতি জানায়। অবলা নারীর ক্রন্দনে আর নিষ্ক্রিয়, নীরব না থাকতে পেরে মহাত্মা তখন বললেন, আর কেঁদো না তুমি, শান্ত হও, সামনেই ঐ যে

দোকানটা দেখছ, ওখান থেকে আমার নাম করে একটা পেয়ারা ভাল ধুয়ে নিয়ে এস, আমি তোমার ছেলের রোগমুক্তির জন্য দিচ্ছি।

বৃদ্ধা তখনই ছুটে গিয়ে দোকান থেকে পেয়ারা নিয়ে এল।

বাবা ফলটি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ার পর জয় রাম, জয় রাম বলে সেটি ছুড়ে ফেলে দিলেন গঙ্গার জলে।

এরপর বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললেন, মা বেটি, মা কলকাতায় আর তোর যেতে হবে না, তোর ছেলের অসুখ ভাল হয়ে গেছে। কালই খবর পাবি। মা, এখন বাড়ি গিয়ে মনের আনন্দে রাম নাম করতে লেগে যা।

পরের দিনই বৃদ্ধার বাড়িতে এক জরুরী তার এল: রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে, তার মায়ের আর কলকাতা আসবার দরকার নেই।

এই বৃদ্ধা যতদিন বেঁচে ছিল—প্রতিদিন ভোরে এসে বাবাকে প্রণাম করে যেত, শিবজ্ঞানে করত তাঁর স্তবস্তুতি।

* * * *

বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অযোধ্যা সিং ইংরেজিতে The glory of Horibor Baba নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় হরিহর বাবার যোগৈশ্বর্য মনুষ্যেতর প্রাণীর উপরও কেমন প্রভাব বিস্তার করত তার এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। ঘটনাটা এই—

সেদিন নাগোয়া অঞ্চলে মহা হুলুস্থুল পড়ে গেছে। কাশী-রাজের এক বৃদ্ধ হাতী ক্ষিপ্ত হয়ে রামনগরে চারিদিক লণ্ডভণ্ড করে গঙ্গা পার হয়ে বারাণসী শহর তোলপাড় করতে আসছে। উত্তেজিত অবস্থায় বৃংহন-নাদ করতে করতে করতে হাতীটি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে অসির তুলসী ঘাটের দিকে আসতে সুরু করে।

ঐ ঘাটেরই এক কোণে এক বৃক্ষছায়ায় হরিহর বাবা তাঁর

ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন। চক্ষু ছুটি নিমীলিত, বাহ্য জ্ঞান নেই। উন্মত্ত হস্তী ভয়ংকর চীৎকার করতে করতে বাবার সামনে এসে হাজির হ'ল। আশেপাশের লোকজন পাগলা হাতী আসছে দেখে ভয় পেয়ে আগে থেকেই বহুদূরে সরে পড়েছে। ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তারা চেয়ে আছে বাবার দিকে। হস্তিপদতলে পিষ্ট হয়ে এই বুঝি বাবার ভব-লীলা সাঙ্গ হয়!

কিন্তু এই সময় দেখল তারা এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। হাতীটি হরিহর বাবার দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই কোন এক ইন্দ্রজাল-বলে মুহূর্তমধ্যে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। শুঁড়টি নীচু করে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। উলঙ্গ সাধকের প্রেমে সে যেন চিরতরে বন্দী হয়ে গেছে, নিজস্ব সত্তা বলে আর কিছু নেই।

গৌরীমা

★ ★ ★ ★ ★ ★

বৃন্দাবন, পুষ্কর ইত্যাদি তীর্থ পর্যটন করে গৌরীমা দ্বারকায় এলে, এখানে ঠাকুর রণছোড়জী অলৌকিক ভাবে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। বিগ্রহ দর্শন করবার পর নাটমন্দিরে বসে গৌরীমা জপ করেছেন, এমন সময় হঠাৎ গর্ভমন্দিরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখেন পরম সুন্দর শ্যামকান্তি একটি বালক সেখানে পরমানন্দে নানা মিষ্টদ্রব্য ভোজন করছে। ভোজনান্তে উঠে দাঁড়িয়ে হাতমুখ না ধুয়েই মন্দিরের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে আর মাঝে মাঝে গৌরীমার দিকে তাকায়।

গৌরীমার এ দেখে প্রথমে মনে হ'ল, বোধ হয় কোন পূজকের ছেলেটেলে হবে, আর এদেশে হয়ত হাতমুখ ধোয়ার ব্যাপারে তেমন কড়াকড়ি নেই। কিন্তু একটু পরেই এক অলৌকিক দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন গৌরীমা। দেখলেন সারা গর্ভকক্ষটি দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মন্দিরের পুরোহিত সসম্ভ্রমে গিয়ে ঐ প্রিয়দর্শন বালকটির হাতমুখ ধুইয়ে দিলেন আর বালকটি তখন পরমানন্দে রণছোড়জীর রত্নসিংহাসনে গিয়ে উপবিষ্ট হ'ল।

এবার গৌরীমার বুঝতে আর বাকী হইল না তার ইষ্টদেব নওলকিশোরই অসীম কৃপায় আবির্ভূত তাঁর নয়ন সম্মুখে। গৌরীমার সারা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল, দুই চোখ থেকে প্রেমাশ্রুর ঢল নামল। তখনই মন্দির দ্বারে ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি ভূমিতলে।

মন্দিরের পুরোহিতের কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে বাকী নেই। গৌরীমা একটু শান্ত হ'লেই তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, মা, আমি বুঝতে পেরেছি, প্রভুজীর কৃপালাভ করেছ তুমি, তাঁর অলৌকিক দর্শন লাভ করে তুমি এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছ।

• • • •

ঠাকুর রামকৃষ্ণের কঠিন পীড়ার সময় গৌরীমা বৃন্দাবনে, নিকটের এক নিভৃত স্থানে তপস্যায় রত। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পূর্বে তাঁর নির্দেশ মত বৃন্দাবনে গৌরীমার কাছে খবর পাঠানো হ'ল। কিন্তু তিনি তখন লালাবাবুর কক্ষ ছেড়ে এক গোপন স্থানে রয়েছেন বলে এ সংবাদ আর তাঁর কাছে পৌঁছল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তিম শয্যায় শুয়ে একদিন সারদামনির কাছে বললেন, এতদিন কাছে থেকে গৌরী শেষটায় দেখতে পেল না। এতে আমার ভেতরটা যেন বিল্লীতে আঁচড়ায়।

অগণিত ভক্তকে শোক সাগরে নিমগ্ন করে ঠাকুর তাঁর নরলীলা

সংবরণ করলেন।

নিভৃত তপস্যার স্থান থেকে বৃন্দাবনে লালাবাবুর কুঞ্জে ফিরে এসে গৌরীমা শুনলেন তাঁর পরমারাধ্য গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেছেন।

দুঃসহ শোকে মুহ্যমান হয়ে গৌরীমা প্রথমে কাঁদতে লাগলেন তারপর হ'ল অভিমান, জেনেশুনেও ঠাকুর কেন তাঁকে বৃন্দাবন আসতে বাধা দিলেন না। গৌরীমা যে এবার তাঁর পরমাশ্রয় হারিয়ে ফেললেন, এখন ত তাঁর জীবনের কোন অবলম্বনই রইল না। অভিমানে দিশেহারা হয়ে ভাবলেন, এ দেহ আর রাখব না, ভৃগুপাতে বিসর্জন দেব।

এই সংকল্প নিয়ে যমুনার ভাঙনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন জলে ঝাঁপ দেবেন বলে, এমন সময় ঘটল এক অলৌকিক ব্যাপার: ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুই মরতে চাস না কি?

গৌরীমা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, তারপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়াতেই দেখেন সে অলৌকিক মূর্তি, আর সেখানে নেই।

গৌরীমা বুঝলেন তাঁর মৃত্যুবরণ ঠাকুরের অভিপ্রেত নয়, বেঁচে থেকে আরও কিছু সাধন ভজন, ঈশ্বরীয় কর্তব্য তাঁকে করে যেতে হ'বে। বাধ্য হয়ে ফিরে এলেন তিনি লালাবাবুর কুঞ্জে।

মাতাজী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী

মাতাজী জ্ঞানানন্দের জন্মের ইতিহাসই রীতিমত অলৌকিক। মাতাজী নেপালী। পিতা বীরসিংহ সমসের জং বাহাদুর রাণা। নেপালের এক বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন তিনি। যাগযজ্ঞ, পূজা, দান ব্রত উদ্‌যাপনে প্রবল উৎসাহ তাঁর।

মাঘ মাস। কয়েকদিন পরে পশুপতিনাথজীর মন্দিরে শিবরাত্রি উৎসব। এই উৎসবের পরেই সপরিবারে তীর্থ দর্শনে বেরুবেন ঠিক করলেন তিনি।

চতুর্দশীর আগের দিন গভীর রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন বীরসিংজী। দেখলেন তাঁর গৃহ দেবতা নারায়ণ শিলা মাঘ মাসের তীব্র শীতেও রীতিমত ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছেন। এবং তাঁর প্রস্তর দেহ নিঃসৃত ঘর্মধারা তাঁর উপাধান ও শয্যা সিক্ত করে টপটপ করে নীচে গড়িয়ে পড়ছে, আর রাণাজী তা দেখে এগিয়ে গিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে অঞ্জলি পুরে তা পান করছেন।

ভোরে ঘুম থেকে উঠেই রাণা তাঁর পত্নীকে ডেকে তুলে সবিস্তারে খুলে বললেন তাঁকে নিজের অদ্ভুত স্বপ্নবৃত্তান্ত।

শুনে স্ত্রী বলে উঠলেন, সে কি গো, আমিও যে ঠিক ঐ রকম স্বপ্নই দেখেছি, এবং স্বপ্নে ঐ ঘর্মজল আমিও পান করেছি। চলো ত ঠাকুর ঘরে গিয়ে একবার দেখি, কি ব্যাপার!

দুইজনই তখন পূজারীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির মন্দিরে ঢুকলেন। ঢুকে দেখেন শ্রীবিগ্রহের শয্যা ও কলেবর তখনও সিক্ত, এবং ঘর্মজলের ধারা গড়িয়ে পড়েছে পূজাবেদীর নীচে।

দেখে পূজারী ভয় পেয়ে গিয়ে করজোড়ে সিংজীকে বলে উঠল,

দোহাই রাণাজী, প্রভুর সেবায় আমি কোন ত্রুটি করি নি, কিন্তু এই দারুণ শীতের রাত্রে শ্রীঅঙ্গ যে কি করে এত ঘেমে উঠল তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বীরসিংহজী পূজারীকে সান্ত্বনা দিয়ে এগিয়ে গেলেন শ্রীবিগ্রহের কাছে, তারপর তাঁর সিক্ত পরিচ্ছদ ও শয্যা নিংড়ে ঘর্মজল বের করে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে মিলে তা পরম শ্রদ্ধাভরে পান করলেন। সিংজী এরপর শঙ্কিত পূজারীর দিকে চেয়ে বললেন, আপনার কোন অপরাধ নেই। প্রভুজী এ কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন—হয়ত আমাদেরই কোন কৃপা করবেন বলে।

কিছুকাল পরে দেখা গেল রাণার কথাই সত্যি। সপরিবারে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পাটনায় এসে জানলেন পত্নী তাঁর সন্তানসম্ভবা। স্ত্রীকে বিশ্রাম দেবার জন্য কয়েক মাস ওখানকার গঙ্গাবক্ষেই রয়ে গেলেন। যথাসময়ে রাণাপত্নী লাভ করলেন এক সুলক্ষণা কন্যা। এ কন্যা বিষ্ণুকৃপায় লাভ হ'ল বলে নাম রাখা হ'ল এর বিষ্ণুপ্রিয়া। এই বিষ্ণুপ্রিয়াই উত্তর কালের মহাসাধিকা মাতাজী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

বিষ্ণুপ্রিয়া কৈশোরে উপনীত হয়েছেন। শৈশব থেকেই প্রভু সীতারামজীর দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল। ব্রহ্মচারিণী পিসীমার গুরুদেব এক মহাত্মা। তিনি প্রাসাদে এলে তাঁকে ধরে তিনি ইষ্ট লাভের জন্য যে সাধনভজনের প্রয়োজন তার নিগূঢ় প্রক্রিয়াটাও জেনে নিয়েছেন। কিছু কিছু অনুভূতি হচ্ছে। মনে দিব্য আনন্দ। এর মাঝেই স্থির করে ফেলেছেন, আজীবন ব্রহ্মচারিণী থেকে ইষ্ট লাভের সাধনায়ই তিনি জীবন কাটাবেন।

এদিকে মেয়ের বিয়ের সময় হওয়ায় বীরসিংহজী তাঁর জন্য সম্ভ্রান্ত ঘরের এক পাত্র নির্বাচন করেছেন। পাত্র সৎ, সুদর্শন এবং নানা গুণের অধিকারী।

সম্বন্ধের কথা কানে যেতে বিষ্ণুপ্রিয়া একেবারে বেঁকে বসলেন।

অন্তঃপুরিকাদের তিনি দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিলেন, বিয়ে তিনি করবেন না। আজীবন কুমারী থেকে সীতারামজীর আরাধনা করবেন। বিয়ের সম্বন্ধ যেন অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া হয়।

বীরসিংহ মেয়ের কথা শুনে প্রমাদ গণলেন। কিন্তু দক্ষ প্রশাসক, সুচতুর রাজনীতিক তিনি। সেদিন বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর দৈনন্দিন পূজাধ্যান শেষ করে সবে উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় তিনি মেয়ের ঘরে ঢুকলেন। আসন পরিগ্রহ করেই মেয়ের সঙ্গে তাঁর প্রবণতা এবং রুচি অনুযায়ী আরম্ভ করলেন নানা কথাঃ রামসীতার যে স্বর্ণবিগ্রহ তিনি মেয়ের আবদারে তাঁর জন্য তৈরী করিয়ে দিয়েছেন তা কেমন হয়েছে, সিংহাসন কেমন হয়েছে, পূজা-অর্চনার আর কি ভাল ব্যবস্থা করা যায় এই সব কথা বলে মেয়েকে তিনি প্রথমে বেশ উৎসাহিত করে তুললেন। এরপর অবতারণা করলেন মনের আসল কথাটির ঃ

আচ্ছা মা, সীতারামজীর কোন গুণটি আমার সব চাইতে বড় মনে হয়, জানো? সে হচ্ছে তাঁর অসাধারণ পিতৃভক্তি। পিতৃসত্য পালনের জন্য সুখের রাজ্যভোগ ছেড়ে বনবাসের কি নিদারুণ কষ্টই না বরণ করে নিলেন! এখন আমার কথা হচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্রই যখন তোমার আরাধ্য, তখন তোমারও কি উচিত নয় পিতৃসত্য পালনের জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করা? তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে—আমি পাত্রপক্ষকে কথা দিয়েছি, এখন সে কথা না রাখতে পারলে আমার পিতৃপুরুষদের অধোগতি হ'বে। এর চেয়ে আমার মৃত্যুও অনেক ভাল। এমন তুমি ভেবে দেখে বলো তোমার ইষ্টের আদর্শ স্মরণ করে তোমার পিতৃসত্য এবং পিতার মান সম্মান রক্ষা করবে কি না!

বলতে গিয়ে বাপের চোখদুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল এবং তাই দেখে মেয়েরও কান্না পেয়ে গেল, বিষ্ণুপ্রিয়া লুটিয়ে পড়লেন বাপের স্নেহময় কোলে।

বাপ মেয়েকে কিছুক্ষণ সান্ত্বনা দেবার পর বললেন, বিয়েতে তা হ'লে তোমার অমত নেই ত? বিয়ের দিন আমাদের ঠিক করাই আছে। তা হ'লে ঐ দিনের জন্যই আমরা প্রস্তুত হই?

উত্তরে বিষ্ণুপ্রিয়া মৃদুস্বরে বললেন বেশ, সীতারামজীর চরণ স্মরণ করে পিতৃসত্য আমি পালন করব, পিতাজী।

বাপের বাক্‌চাতুর্যে হার মানতে হয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়ার, মত দিয়েছেন তিনি বিয়েয়, কিন্তু মনে তাঁর এক ফোঁটা শান্তি নেই। সারাদিন মুখ ভার করে থাকেন, তাতে একটুও হাসি নেই, উজ্জলতা নেই। এমনি করেই তাঁর দিন কাটে, স্নেহময়ী গুরুজনেরা নানা কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেন। প্রবোধ মানে না তা'তে বিষ্ণুপ্রিয়ার মন।

বিয়ের আর তিন দিন মাত্র বাকী। সেদিন ভোর হ'তে না হ'তেই দ্রুতপদে বিষ্ণুপ্রিয়া ব্রহ্মচারিণী পিসীমার কামরায় গিয়ে হাজির: পিসীমা! পিসীমা দেখলেন ভাইঝির চোখেমুখে আনন্দ যেন একেবারে উপচে পড়ছে: কি রে, ব্যাপার কি, বড় যে খুশী খুশী লাগছে?

তাই বলতেই ত তোমার কাছে ছুটে এলাম, পিসীমা। জানো, আমার ইষ্টদেব সীতারামজীর কৃপা হয়েছে আমার উপর। তিনি আমার মনের ব্যাথা প্রাণের কথা শুনেছেন। কা'ল রাত্রে তিনি আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি আগে থেকেই এত ঘাবড়ে গিয়েছ কেন? এ জন্মে যে তোমার বিয়ে হবে না এ তো বিধিনির্দিষ্ট। যাও, আর মন খারাপ করে থেকো না। এই স্বপ্ন দেখার পর মনে আমার আর কোন দুঃখ নেই, উদ্বেগ নেই। তোমারা যতই হৈ চৈ করো, দেখো এ বিয়ে আমার ভেঙে যাবে। প্রভুজীর কথা কি কখনও মিথ্যা হ'তে পারে?

ভাইঝির জন্য পিসীমার দুশ্চিন্তাও কিছু কম নয়, তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ঠাকুরের যা অভিরুচি—তাই হবে: তুই যেন এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলিস না।

স্বপ্নের কথা স্মরণ করে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের যেন দুঃখের ভার সব অপসারিত হয়ে গেছে, উৎফুল্লচিত্তে সে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

পরের দিনই সিংজীর বাড়ীতে খবর এল আকস্মিক কঠিন রোগের আক্রমণে পাত্র দেহত্যাগ করেছে।

কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া অমনিতেই বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, তারপর দৈবের এই প্রতিকূলতা দেখে বীরসিংজী স্থির করলেন, এরপর মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না।

• • • •

বিশ বৎসর বয়সে মা-বাপের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে মাতাজী অদ্বৈতানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাক্ষাৎ ঘটে। বিষ্ণুপ্রিয়া এঁর-কাছ থেকেই সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনে নাম হয় তাঁর মাতাজী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

সন্ন্যাসের পর পরিব্রাজনে বেরিয়ে আর আর গুরু-ভগ্নীদের সঙ্গে মাতাজী জ্ঞানানন্দ এক সময় জলন্ধরে এসে হাজির হ'ন। এখানে ভবানী-মা নামে এক তন্ত্রসিদ্ধা বৃদ্ধা ভৈরবীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ভৈরবী মাতাজীকে দেখামাত্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'ন, এবং মাতাজী শংকর-মতের অনুগামিনী জেনেও তাঁকে আহবান করে শক্তিপীঠে কিছুকাল দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর আরাধনা করতে বলেন, এতে সিদ্ধিলাভ করলে তাঁর কাজ সহজতর হবে।

মাতাজী ভবানী-মায়ের অনুরোধে ত্রিপুরাসুন্দরীর আরাধনায় তাঁর দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থা হ'ন। এর-পর ভবানী-মায়ের অনুরোধে মাতাজী হিংলাজ, জ্বালামুখী কাংড়া প্রভৃতি জাগ্রত শক্তিপীঠগুলিও দর্শন করেন।

কাংড়ায় থাকবার সময় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। যে কয়দিন এখানে ছিলেন—প্রতিদিন ভোরে স্নানাদি সমাপন করে তিনি দেবী মন্দিরে প্রবেশ করতেন, সারাদিন ধ্যান জপ করে রাত্রে

আপন কুটিরে ফিরতেন।

একদিন ধ্যানাদি শেষ হবার পর দেখলেন এক বিস্ময়কর অলৌকিক দৃশ্য। দেবীর মূর্তিটি যেন বিশাল আকার ধারণ করে বারবার প্রকম্পিত হচ্ছে, নয়ন যুগল থেকে নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

এতে মাতাজীর মানসপটে ভেসে উঠল যেন আসন্ন এক ধ্বংসলীলার ছবি। তাড়াতাড়ি ধ্যানাসন ছেড়ে উঠে পাণ্ডাদের কাছে সব কিছু বিবৃত করে তিনি বললেন, বাবা সকল, আমি কিন্তু একটা ভয়ংকর বিপদের আভাস পাচ্ছি। মায়ের মূর্তিটা তোমরা কোথাও স্থানান্তরিত করো, আর যাত্রীদেরও এখানে আসতে বারণ করে দাও।

পাণ্ডারা মাতাজীর কথায় কোন গুরুত্ব দিলে না। ভাবলে বেশি ধ্যানধারণার ফলে এই নবীনা সন্ন্যাসিনীর মাথা গরম হয়ে উঠেছে, তাই তিনি এই আবোল-তাবোল বকছেন।

পাণ্ডারা মাতাজীকে বললে, মা, তুমি মিছেমিছি ভেবো না। বিপদের আশংকা থাকলে দেবী নিজেই তাঁর প্রধান পুরোহিতকে সতর্ক করে দিতেন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও, মা।

মাতাজী বললেন, দেখ, মা যা আমায় ইঙ্গিত দিলেন, তাই তোমাদের আমি জানালাম। তোমাদের সকলের জন্যই আমার ভাবনা, আমার নিজের জন্য নয়, এখন তোমাদের যা অভিরুচি হয় তাই করো। আমি রোজকার মতই মন্দিরে এসে পূজা ধ্যানে বসব, কিন্তু তোমরা খুব সাবধানে থেকো।

পরদিন ভোরে মাতাজী সবে এসে দেবীমূর্তীর সামনে ধ্যানাসনে বসেছেন অমনি প্রচণ্ড শব্দে ভূমিকম্প সুরু হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি-উদগীরণ। বিশাল মন্দিরের দেয়াল-গম্বুজ ভেঙ্গে পড়তে লাগল, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিকে অন্ধকার। এই ধ্বংস তাণ্ডবের মাঝে অকস্মাৎ এক দেবীমূর্তী আবির্ভূতা হয়ে মাতাজীর হাত ধরে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে অন্তর্হিতা হ'লেন। ততক্ষণে

দেবীর মন্দিরটি এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

নিজের আস্তানায় ফিরে আসবার সময় মাতাজী দেখলেন ধ্বংসলীলা তখনও থামেনি, পাণ্ডাদের ঘরগুলি সব ধ্বসে পড়েছে। মৃত্তিকা ভেদ করে পথের নানা স্থান থেকে উষ্ণ জলধারা নির্গত হচ্ছে। স্থানীয় লোক সব বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দেখলেন যে এলাকায় মাতাজীর কুটিরটি অবস্থিত সে অঞ্চলের কোন ক্ষয়-ক্ষতিই হয় নি।

এই ধ্বংসলীলার কথা মাতাজী ধ্যানবলে আগেই বুঝতে পেরে পাণ্ডাদের তা জানিয়ে দিয়েছিলেন—এ কথা প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাতাজীর অলৌকিক শক্তির খ্যাতি চারিদিকে রটে গেল, দলেদলে লোক এসে ভিড় করতে লাগল এই নবীনা সন্ন্যাসীনীর কাছে।

০ ০ ০ ০

কাংড়ায় দর্শনার্থীর ভিড়ে সাধনার বিঘ্ন হতে থাকায় মাতাজী তাঁর সঙ্গিনী দুই গুরু ভগ্নীকে নিয়ে পদব্রজে অযোধ্যায় এসে হাজির হ'লেন। সেখানে কিছুদিন শ্রীরামবিগ্রহের উপাসনা করে রওনা হ'লেন সীতাদেবীর জন্মভূমি জনকপুরের দিকে। জনকপুরের কাছাকাছি একটা গ্রামে উপস্থিত হতেই দূর থেকে এক ব্রাহ্মণ তাঁকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লেন তাঁর পদমূলে।

ব্যাপার দেখে চারিদিকে অমনি লোকের ভিড় জমে গেল। ব্রাহ্মণের নাম রঘুজীবন ত্রিবেদী। এ অঞ্চলের সবাই জানে তিনি এক উঁচু দরের সাধক, সীতারামজীর পরম ভক্ত। কয়েকদিন আগে ত্রিবেদী স্বপ্ন দেখেছেন, মা-জানকী তাঁকে এসে বলছেন, বাবা তোমার ওপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। ঠিক করেছি শীগগিরই তোমার ঘরে গিয়ে আমি তোমার সেবা গ্রহণ করব।

মা-জানকীর প্রতীক্ষায় কয়েক দিন কাটাবার পর ত্রিবেদীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি যদি না-ই আসেন তা হ'লে ত্রিবেদী প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করবেন—সংকল্প করেন। ঠিক এই সময়

মাতাজী জ্ঞানানন্দ এলেন তাঁর গ্রামে। মাতাজীকে দেখামাত্র ত্রিবেদীর মনে হ'ল ভক্তের জীবনরক্ষার জন্যই এই দিব্যদর্শনা সন্ন্যাসীনী মূর্তিতে মা-জানকী এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর গৃহদ্বারে।

ভূলুণ্ঠিত ভক্তের দিকে চেয়ে মাতাজীর নয়নদুটি স্নেহ-সজল হয়ে উঠল। ত্রিবেদীর হাত ধরে উঠিয়ে মধুর কণ্ঠে বললেন, তুমি স্থির হও, বাবা, আমি তোমাদের এখানেই কিছুদিন থাকব, কিন্তু আমি সন্ন্যাসীনী, বাবা, তোমাদের গৃহে ত আমি বাস করতে পারব না, প্রাঙ্গনের ধারে আমার জন্য একটা তৃণ-কুটির তৈরী করে দাও, তাতেই থাকব আমি।

মাতাজীর আদেশ পালন করে মাতাজীকে সেখানে রেখে রঘুজীবন ত্রিবেদী সপরিবারে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এইখানে থাকবার সময় চারিদিকে ভক্তদের নিয়ে মাতাজী ভাবাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন, এমন সময় হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, আহা, তুলসীর ছেলেটা কুয়োয় পড়ে গেল! ছেলেটাকে না বাঁচালে ওর মা তো প্রাণে বাঁচবে না।

তুলসী এই গ্রামেরই এক গরিব বিধবা। মাতাজীর উপর তার গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি আর বিশ্বাস। রোজ তাঁকে প্রণাম করতে এসে ধর্মকথা শুনে যায়। একই মাত্র ছেলে তার, নয়নের মণি।

মাতাজীর এ স্বগতোক্তি শুনে মর্মাহত হ'ল সবাই। দুই একজন তখনই তুলসীর বাড়ীর দিকে ছুটে গেল কি ব্যাপার জানতে। সেখানে গিয়ে যে খবর পাওয়া গেল—তা সংক্ষেপে এই। তুলসীর ঘরের পাশেই কুয়ো। ছেলেটা খেলা করতে করতে কি করে হঠাৎ তার মাঝে পড়ে যায়। দেখে আর্তকণ্ঠে কেঁদে ওঠে তুলসী, বুক-ফাটা কান্না। এই সময় কোত্থেকে এক বলশালী পুরুষ এসে কূপ থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করে এনে তার প্রাণ বাঁচায়। লোকের হট্টগোলের মাঝে উদ্ধারকারী লোকটি কোথায় যে উধাও হয়ে যায়, কেউ তা বলতে পারে না। তার পরিচয়ও কারো জানা নেই।

ঘটনার কথা সব কিছু শুনে মাতাজী সংক্ষেপে শুধু বললেন, ভগবৎকৃপা কখন কি ভাবে আসে কেউ তা বলতে পারে না। তার কৃপা নানা রূপ ধরে নানা ভঙ্গিতে আসে। এ অনেক সময়ই ঘটতে দেখা যায়।

এ ঘটনার পর মাতাজীর যোগৈশ্চর্যের খ্যাতি ঐ অঞ্চলে রটে যাওয়ায় ত্রিবেদী ভবনে অনেক আর্ত ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভিড় হ'তে থাকে।

• * • •

চন্দ্রনাথ দর্শন করে সঙ্গিনীদের নিয়ে কামাখ্যা পাহাড়ে এসেছেন মাতাজী। দেবীমন্দিরে প্রবেশ করতেই তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে পড়েন। বহু চেষ্টার পর তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়। এ তীর্থস্থানটা বড় ভাল লাগে মাতাজীর।

কয়েক দিন পর সঙ্গিনীরা যখন কামাখ্যা ত্যাগ করবার আয়োজন করছেন তখন তিনি তাদের বলেন, তোমরা যেতে চাও যাও, আমি কিছুকাল এখানে কাটাব।

সঙ্গীনীরা অনেক সাধ্য-সাধনা মিনতি করেও তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে না পারায় তাঁরা চলে গেলেন, মাতাজী একাই রইলেন কামাখ্যা-তীর্থে।

সেদিন অন্যদিনের মত দেবীমন্দিরে ধ্যানজপ শেষ করে বেলাশেষে পাহাড় থেকে নামছেন মাতাজী। পার্বত্যপথে ধীরে-ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। হঠাৎ কম্প দিয়ে এসে গেল, প্রবল জ্বর। পথে লোকজন নেই যে কাউকে সাহায্য করতে ডাকবেন। জ্বরতপ্ত ক্লান্ত দেহটি একটি বৃক্ষতলে এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারালেন মাতাজী।

সংজ্ঞা ফিরে এলে দেখেন জ্বর নিয়ে এক সহৃদয় পাণ্ডার বাড়িতে তিনি উত্তম শয্যায় শায়িতা। সবাই মহাব্যস্ত হয়ে তাঁর সেবাযত্ন করছে।

মাতাজী ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কোথায়, কি করেই বা তিনি এখানে এলেন।

মাতাজীর প্রশ্নের উত্তরে গৃহকর্ত্রী বললেন, মা, রাত্রে বছর দশেকের একটি মেয়ে তোমায় আমাদের ঘরে নিয়ে এল। মেয়েটি দেখতে বড় সুন্দর, শ্যামলা গায়ের রঙ, সারাদেহে লাবণ্য যেন উপচে পড়ছে। ডাগর কাজল চোখ দুটি করছে জ্বলজ্বল। প্রবল জ্বরে তখন তোমার হুঁশ নেই। নিজের পরিচয়ে বললে, সে তোমার ছোটবোন। বললে, আমার দিদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তোমরা তাকে একটু আশ্রয় দাও। এরপর সযত্নে তোমায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল, আর তার কোন পাত্তা নেই। এদিকে তোমায় নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত, এর উপর বোন আবার তোমার কোথায় গেল তা নিয়েও ভেবে মরছি।

আমি সন্ন্যাসীনী, মা, একা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই, গৃহস্থাশ্রম ছেড়েছি বহুকাল। তা ছাড়া, মা, পূর্ব্বাশ্রমে আমার ত কোন ছোট বোন ছিল না—উত্তর দিলেন মাতাজী।

পাণ্ডার ঘরের সবাই প্রথমে এ কথা শুনে ত অবাক হয়ে গেল, তার পর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল,—ঐ শ্যামা মেয়েটি তা হ'লে দেবী কামাখ্যা ছাড়া আর কেউ নয়, আর ঐ সন্ন্যাসিনী তা হ'লে নিশ্চয় উচ্চ কোটির সাধিকা। পথে বিপন্ন হওয়ায় জগন্মাতা কামাখ্যা মাঈ নিজে ছোটবোন সেজে একে ভাল আশ্রয়ে রেখে গেছেন।

দেবী সারদামণি

★ ★ ★ ★ ★ ★

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী দেবী সারদামণি জয়রামবাটিতে পিতৃ-গৃহে অবস্থান করছেন। বয়স প্রায় আঠারো বৎসর হ'ল। স্বামী সন্দর্শনে উন্মুখ হয়ে আছে মন। কিন্তু কানে আসছে যে সব মর্মভেদী সংবাদ! গ্রামে প্রচারিত হয়েছে সারদার স্বামী গদাধর চাটুজ্জে দক্ষিণেশ্বরে সাধক রামকৃষ্ণ নামে খ্যাত হয়েছেন বটে, কিন্তু সাধন ভজন করতে গিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাঁর, পাগল হয়েছেন তিনি। শুনে শুনে সারদামণি ভাবেন—সত্যিই কি তিনি উন্মাদ হয়ে গেছেন? যদি সত্যি তাই হয় তা হ'লে এ দুঃসময়ে উচিত ত তাঁর স্বামীর পাশে গিয়ে থাকা, তাকে দেখাশুনা সেবা শুশ্রূষা করা।

গ্রামের বহু স্ত্রীলোক কোন এক পর্ব উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে। শুনে সারদার মনে হ'ল এই সুযোগ—তিনি একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে নিজে দেখে আসবেন স্বামীকে।

কোন এক যাত্রিনীর কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করলে সে কথাটা সারদার পিতা রামচন্দ্রের কানে তুললো। মেয়ের মনের ব্যথাটা বুঝে বাপ বললেন, বেশ ত, সারদা এই সুযোগে তার স্বামীর কাছে যা'ক, আমিও তার সঙ্গে যাব।

গ্রাম থেকে যাত্রা সুরু হ'ল। পদব্রজে প্রায় ষাট মাইল পথ যেতে হ'বে। দু'দিন চলার পরেই সারদা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হ'লেন। তা ছাড়া অনভ্যস্ত পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত, চরণ ক্ষত বিক্ষত। বাধ্য হয়ে বাপ বেটিতে রাস্তার পাশের চটিতে আশ্রয় নিলেন।

জ্বর বাড়ছে সারদার, সেই সঙ্গে বাড়ছে মনোবেদনা: আর

বুঝি দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হ'ল না, স্বামিসন্দর্শনের আকাংক্ষা মিটল না।

জ্বরে বেহুঁশ হয়ে এক কামরায় পড়ে আছেন সারদা। এই সময়ে এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল তাঁর জীবনে। কোত্থেকে ধীর পদক্ষেপে মমতাময়ী এক নারী এসে তাঁর পাশে বসলেন। বর্ণ তাঁর শ্যাম, কিন্তু কি অপরূপ তাঁর দেহকান্তি। নয়ন দুটি থেকে ঝরে পড়ছে যেন অপার স্নেহ করুণা আর ভালবাসা। সারদার কাছ ঘেষে বসে ঐ নারী পরম স্নেহে হাত বুলাতে লাগলেন তাঁর গায়ে আর মাথায়। তাঁর স্নিগ্ধ কোমল করস্পর্শে সারদার সকল জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল, অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠল দেহমন।

তুমি কে, ভাই. কোত্থেকে আসছ ?—ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন সারদা।

আসছি আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে, উত্তর দিলেন অপরিচিতা।

শুনে সারদা আনন্দে কিছুক্ষণ কথা বলতেই পারলেন না, তার পর একটু সামলে নিয়ে কোন রকমে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছ ? সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখব, সেবা করব, কত আশা নিয়েই না বেরিয়েছিলাম, দারুণ জ্বরে পড়লাম পথে, মনোবাঞ্ছা হয়ত আর পূর্ণ হবে না।

তা হ'বে বই কি,—দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি তুমি! কা'লই ভাল হয়ে যাবে, সেখানে যাবে, গিয়ে তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই ত তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি আমি!

তাই বুঝি। তা তুমি আমাদের কে হও গা ?

আমি তোমার বোন হই, ভাই।

বটে! তাই তুমি আমার কাছে এসেছ ? দেখতে এসেছ ?

এই সব কথাবার্তা হবার পরেই সারদামণি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। পরদিন ভোরে দেখা গেল তাঁর জ্বর আর নেই, গ্লানিও তেমন নেই। এই অলৌকিক দিব্যদর্শনের পর

তাঁর দেহ মনে এসে গেছে নতুন বল, নতুন উৎসাহ। বাপের হাত ধরে ধীর পদে যাত্রা করলেন তিনি চটি থেকে। একটু যেতেই সৌভাগ্য-ক্রমে একটা খালি পালকী পাওয়া গেল তাঁর জন্য। বাপ নিশ্চিন্ত হ'লেন।

• • • *

কাশীপুরে শ্রীঠাকুর যখন অন্তিম শয্যায়—তখনকার কথা। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা এসে সবাই মিলে তাঁর সেবা পরিচর্যা করে চলেছে। বয়স সবারই অল্প ; প্রাণ চঞ্চল। বাগানের দক্ষিণ কোণে একটা খেজুর গাছ আছে, তরুণ ভক্তের দল ঠিক করলেন সন্ধ্যার পর ঐ গাছ থেকে জিরণের রস খাবেন তাঁরা। এ নিয়ে বেশ কিছু হৈ চৈ করা যাবে, মন চাঙ্গা হবে।

শ্রীঠাকুরকে এ বিষয়ে তাঁরা কিছু বলেন নি। নিরঞ্জন এবং আর আর সবাই দল বেঁধে চলে গেলেন ঐ দিকে।

এমন সময় সারদামণি এক অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন! ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেন হঠাৎ বিছানা ছেড়ে তীর-বেগে ছুটে গেলেন নীচের বাগানে! সারদামণি স্তম্ভিত হয়ে ভাবছেন এটা কি করে সম্ভব হ'ল? যে মুমূর্ষু রোগীকে বিছানায় পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়, তিনি কি করে সিঁড়ি বেয়ে শক্ত সমর্থ মানুষের মত অমন ছুটে যেতে লাগলেন!

ঠাকুরের ঘরে ঢুকে দেখলেন বিছানায় তিনি নেই, বারান্দায় খুঁজে দেখলেন সেখানেও নেই, তবে? দুশ্চিন্তার অবধি রইল না তাঁর মনে।

একটু পরেই আবার তিনি দেখলেন,—ঠাকুর আগের মত তীব্র বেগে স্বদেহে ফিরছেন। ঔৎসুক্য নিবৃত্তির জন্য ঠাকুরকে যখন তিনি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ঠাকুর বলে উঠলেন, তুমি দেখে ফেলেছ না কি? তারপর বললেন, ছেলেরা যারা সব এখানে এসেছে তারা সবাই ছেলেমানুষ। আনন্দ করে ওরা

বাগানের একটা খেজুর গাছের রস খেতে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম ঐ গাছের নীচে একটা কালসাপ রয়েছে। সে ভীষণ বদ্‌রাগী, ওদের সবাইকে কামড়াতো। ওরা এ খবর রাখে না। তাই অন্য পথে আমি সেখানে গিয়ে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম, বলে এলাম, আর কখনো এখানে ঢুকিস নে।

এরপর ঠাকুর স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বললেন, তুমি এ কথা যেন আর কাউকে বলো না।

০ ০ ০ ০

অসীমের মা নামে এক ধার্মিক মহিলা প্রায়ই ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসতেন, কখনও কখনও নহবতে গিয়ে মা সারদামণির কাছে গিয়েও তিনি বসতেন। এই মহিলার ধারণা ছিল ঠাকুরই স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ। আবার কখনও কখনও কিছু সন্দেহও জাগতো মনে। ভাবতেন সত্যিই যদি উনি বিশ্বনাথ হ'বেন, তা হ'লে ওঁর সাঙ্গোপাঙ্গ কোথায়, গলায় বিষধর সাপ কোথায়, আর স্বয়ং পার্বতী ত পাশে থাকবেন। কই, সে সব কিছু ত কোন দিন চোখে পড়ে না। তা হলে ইনি হয়ত শিব ন'ন, আমিই কল্পনায় ওঁকে শুধু একটি দেবমূর্তিতে খাড়া করতে চাইছি।

একদিন মহিলা নহবতে বসে ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষীদেবীর সঙ্গে কথা বলছেন ; ঠাকুর তখন ধ্যানে বসবার জন্য বেলতলার পঞ্চমুণ্ডী আসনের দিকে চলেছেন, এদের ডেকে বললেন, তোমরা কি সব বলাবলি করছ, এসো না সবাই বেলতলা গিয়ে বসি, নানা ধর্ম কথা হবে।

হাতের কাজকর্ম সারা হ'তে লক্ষীদেবীর কিছুটা দেরী হয়ে গেল। ঠাকুর এর মাঝে বেলতলায় গিয়ে ধ্যানে বসে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর লক্ষী দেবী ও অসীমের মা সেখানে এলে ঠাকুরের দিকে তাকাতেই ত একেবারে 'থ'। তাঁরা দেখলেন —ঠাকুর দুই চক্ষু নিমীলিত করে সমাধি মগ্ন আর মস্ত বড় একটা

সাপ ফণা বিস্তার করে নিশ্চল হয়ে রয়েছে তাঁর পিছন দিকে। আশে পাশে ফণা নাচিয়ে খেলা করছে আরও কয়েকটি বিষধর। দেখে অসীমের মা ত ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলেন, কি ছেলেমানুষি বুদ্ধি জেগেছিল আমার মনে, কেন আমি ঠাকুরকে বিশ্বনাথ-রূপে দেখতে চেয়েছিলাম! এখন এই সাপগুলো ঠাকুরের কি করে বসে তার ঠিক কি!

এদিকে লক্ষ্মীদেবী চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে দেখছেন ঠাকুরের লোকোত্তর আর এক দিব্য রূপ। তিনি দেখছেন ঠাকুর শিবরূপে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন আর তাঁর বাম ঊরুতে বসে আছেন দেবী সারদামণি।

দেখে লক্ষ্মীদেবী ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন: এই ত দেখে এলাম খুড়ীমা নহবতে গৃহস্থালির কাজ করছেন। এর মাঝে তিনি কি করে এলেন এখানে, এই ভঙ্গিতে বসবেনই বা কেন? দিনের স্পষ্ট আলোতে এমনটি ঘটবেই বা কি করে?

মনের দ্বন্দ্ব মিটাতে লক্ষ্মীদেবী তখনই ছুটে গেলেন নহবতে। গিয়ে দেখেন সারদামণি সেখানেই রয়েছেন, রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত। ভেবে দিশে না পেয়ে লক্ষ্মীদেবী এলেন বেলডাঙ্গায়। সেখানে এসে দেখেন আবার আগেকার সেই বিস্ময়কর দিব্যদৃশ্য।

একটু পরে সাপগুলি ঠাকুরের ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, ঠাকুর তখনও ধ্যানে স্থানুবৎ নিশ্চল। দূর থেকে ভক্তি-ভরে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে লক্ষ্মীদেবী ও অসীমের মা দুইজনই নিজের নিজের ইষ্ট নাম জপে নিবিষ্ট হ'লেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ধ্যান ভঙ্গ হলে লক্ষ্মীদেবী নহবতে গিয়ে সারদামণিকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে সোৎসাহে তাঁর দিব্যদর্শনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে মন্তব্য করলেন, খুড়ীমা, তুমি ত সামান্য মেয়ে নও! খুড়ো মশাই যে বলেন, আমি কি

আর লাউ শাক-খাকী, পুঁইশাক-খাকীকে বে করেছি, কেন বলেন তা আজ বুঝলাম।

০ ০ ০ ০

ঠাকুর রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সন্ধ্যাকালে একে একে দেহ থেকে অলংকারগুলি খুলেছেন সারদামণি। সর্বশেষে সোনার বালাটিতে যেই হাত দিয়েছেন অমনি ঠাকুর আবির্ভূত হ'লেন তাঁর সামনে—অলৌকিক মূর্তিতে। গলক্ষতের আগেকার সুস্থ দেহটি নিয়েই আবির্ভূত হয়েছেন। সারদামণির হাত চেপে ধরে তিনি বলে উঠলেন, এ কি করছ তুমি, আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর চিহ্ন হাত থেকে খুলে ফেলছ ?

হাতের বালা খোলা তাঁর আর হ'ল না। তিনি বুঝলেন স্বামী তাঁর চিন্ময়, চিরঞ্জীব।

* * ০ ০

ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছেন সারদামণি। মনের গোপন ইচ্ছা প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান তর্পন করে সেখানকার পবিত্র নীরে বিসর্জন দেবেন নিজের কেশদাম। কথাটি মনে এতকাল প্রচ্ছন্নই ছিল, কাউকে আর বলেন নি।

ত্রিবেণী স্নানের আগের দিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছেন সারদামণি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল ঠাকুর রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর : লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী! তাকিয়ে দেখেন ঠাকুরের অলৌকিক মূর্তি। দুই বাহু বিস্তার করে দরজা ধরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার পরেই চকিতে কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

কেন আজ এখানে হঠাৎ ঠাকুরের আবির্ভাব, কণ্ঠস্বরে কেনই বা এমন বিষাদের সুর ? সারদামণি বুঝলেন কেশদাম কর্তন এবং সঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া ঠাকুরের মত নয়। সোনার বালা খুলবার সময়ে যে মানোভাব নিয়ে বাধা দিয়েছিলেন ঠাকুর, সেই মনো-

ভাবেরই ইঙ্গিত রয়েছে তাঁর এই অলৌকিক আবির্ভাব ও বিষণ্ন কণ্ঠস্বরে।

কেশদাম বিসর্জন দেওয়া আর হ'ল না মা সারদামণির।

০ ০ ০ ০

অমন মহাপুরুষ স্বামীর সহধর্মিণী হয়ে তাঁর আদর্শে জীবন কাটানোর পরও কি করে মা সারদামণি সংসারের সঙ্গে যোগ রেখেছিলেন, কেনই বা রেখেছিলে তার মূলেও বেশ কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার আছে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—

ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারের কিছুই আর ভাল লাগছে না, মন সর্বদা হুহু করছে, আর ভাবছি আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে, তখন হঠাৎ দেখি আমার সামনে লাল কাপড় পরা দশ বারো বছরের একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, একে আশ্রয় করে থাকো। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা আসবে।—এই বলেই তিনি অন্তর্ধান হ'লেন, মেয়েটিকেও আর দেখতে পাই নি।

অলৌকিক দর্শনের মাঝে যে মেয়েটিকে সারদামণি দেখেছিলেন সেটি তাঁর ভাইয়ের মেয়ে রাধু। সে তখন শিশু, বাপ মারা গেছে, মা উন্মাদ। একদিন ঠাকুর অলৌকিক ভাবে সারদামণিকে দর্শন দিয়ে শিশুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, যার কথা তোমায় বলেছিলাম,—এই সেই মেয়েটি, একে আশ্রয় করে থাকো,—এ যোগমায়া।

এই পালিতা কন্যা রাধুর পাগলামি ও দৌরাত্ম্য অনেক সহ্য করতে হয়েছে সারদামণিকে। একে কেন্দ্র করেই মন তাঁর নীচুতে নামত, সাংসারিক জীবনের সঙ্গে তাঁর দিব্য সত্তার কিছুটা যোগ রক্ষিত হ'ত। সেবিকা যোগেন-মার মনে এই নিয়েই গোল বাধল: ঠাকুর অমন ত্যাগী পুরুষ ছিলেন আর মাকে দেখছি যেন ঘোর সংসারী: ভাই, ভাইপো, ভাইঝিদের নিয়ে অস্থির।

যোগেন-মার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে ধ্যান করছেন তিনি। এমন সময় পেলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের অলৌকিক দর্শন। ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যোগেন-মাকে বলছেন, ছ্যাখো তো গঙ্গায় ওটা কি ভেসে যাচ্ছে?

যোগেন-মা তাকিয়ে দেখলেন একটা সদ্যোজাত শিশু নাড়িভুঁড়ি জড়ানো অবস্থায় গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

ঠাকুর স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, গঙ্গা কি এতে অপবিত্র হ'ল? ওঁকেও ঠিক তেমনি জানবে। ওঁর উপর যেন কোন সন্দেহ জাগে না মনে, ওঁকে আর—নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—এঁকে অভিন্ন বলে জানবে।

যোগেন-মা এর পর গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে তখনই সারদামণির চরণে প্রণাম করে অনুতাপের সুরে বললেন, মা, তুমি আমায় ক্ষমা করো।

কেন, কি হ'ল গো?

যোগেন-মা তখন আনুপূর্বিক সমস্ত কিছু বর্ণনা করে বললেন, মা, তোমার উপর অবিশ্বাস জেগেছিল আমার মনে, তাই একমাত্র ঠাকুর আমায় দেখা দিয়ে তোমার স্বরূপ চিনিয়ে দিলেন।

সারদামণি মৃদু হেসে বললেন, তাতে কি হয়েছে, অবিশ্বাস ত আসবেই, আবার বিশ্বাসও হবে। এই রকম হ'তে হতেই শেষে পাকা বিশ্বাস আসে।

* * * *

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। ভক্ত সুরেন্দ্র সেনের বড় ইচ্ছা স্বামীজির কাছ থেকে দীক্ষা নেন। অনেক চেষ্টা করে স্বামীজিকে তিনি দীক্ষা দিতে রাজী করালেন। দীক্ষার দিনও ঠিক হয়ে গেল। কয়েকটি যুবকের দীক্ষা হবে সেদিন। একে একে কয়েকজনের দীক্ষা দেবার পর ডেকে পাঠালেন

স্বামীজি সুরেন্দ্র সেনকে। তিনি সামনে এলে বললেন, গ্যাখ ঠাকুর জানিয়ে দিলেন, আমি তোর গুরু নই। তিনি দেখিয়ে দিলেন যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমার চেয়েও বড় হতাশ হবার কোন কারণ নেই, সময় হ'লেই সব হবে।

শুনে সুরেন্দ্রনাথ মর্মাহত হ'লেন: স্বামীজির চাইতে আবার কে বড়?—এ শুধু তাঁর আমাকে এড়াবার অজুহাত। আমি অনুপযুক্ত।

এর কিছুকাল পরে সুরেন্দ্র এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন। দেখেলন তিনি ঠাকুরের কোলে বসে আছেন, এমন সময় এক উজ্জ্বল দেবী-মূর্তি তাঁর সামনে এসে বললেন, একটি মন্ত্র দিচ্ছি তোমাকে, নাও।

সুরেন্দ্র সেন বললেন, আমি ঠাকুরের কোলে বসা, মন্ত্রতন্ত্রের কোন ধার ধারি না।

দেবী মন্ত্র দিতে তবুও জেদ করতে থাকায় সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

আমি সরস্বতি, এই বলেই তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন।

এতে কি হবে,—জিজ্ঞাসা করলেন সুরেন্দ্র সেন।

কবি হতে পারবি।

আমি কবি হতে চাই না।

কবির মানে জানিস?—কবি মানে জ্ঞানী।

এই বলে মন্ত্র জপের প্রণালী দেখিয়ে দিয়ে অন্ততঃ ১০৮ বার জপ করতে তাঁকে আদেশ দিলেন দেবী।

কয়েক দিন পরে স্বামীজিকে দর্শন করতে গিয়ে তাঁর কাছে এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলে বলেন সুরেন্দ্র। শুনে স্বামীজি বলেন, ঠাকুর বলতেন দৈব স্বপ্ন সত্য। একে স্বপ্নসিদ্ধি বলে। এটি জপ করলেই তোর সব কিছু হয়ে যাবে।

আমি স্বপ্নে কোনোদিনই বিশ্বাস করি না। যদি কোন মন্ত্রের প্রয়োজন হয় ত আপনি দিন।

তুই যা পেয়েছিস এটিই তোর সত্য মন্ত্র, এটি জপ করতে থাক। যিনি মন্ত্র দিয়েছেন পরে সশরীরে তাঁকে দেখতে পাবি।

স্বামীজির এ সব কথা সত্ত্বেও সুরেন্দ্র একদিনও জপ করেন নি স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্র। স্বামীজির গ্রন্থাবলী পাঠ করতেন, তাঁকে চিন্তা করতেন। স্বপ্নে মাঝে মাঝে ঠাকুর ও স্বামীজির দেখাও পেতেন। এমনি করে প্রায় সাত বৎসর কেটে গেল। ১৩১৩ সালে পূজার সময় মঠে এলেন, মঠ থেকে কামারপুকুর, কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটি। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর মা সারদামণি সুরেন্দ্রকে কাছে ডেকে এনে বললেন, কি নেবে, বাবা?

তা ত বুঝতে পারি না।

যা চাইবে তাই পাবে; শক্তি নেবে?

শক্তিটক্তি কিছু বুঝি না, আমর কি দরকার তাও জানি না। যদি কিছু দেবার ইচ্ছা হয় তোমার, তা হ'লে যাতে আমার ভাল হয়, তাই দাও।

আচ্ছা কাল সকালে হবে, কিছু ফুল যোগাড় করে রাখবে।

পরদিন দীক্ষা দেবার সময় মা সারদামণি তাঁর ডান হাত সুরেন্দ্রের মস্তকে এবং বাঁ হাত তাঁর চিবুকে রেখে মন্ত্রদান করলেন। মন্ত্র শোনামাত্র স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত ঘটনা এক সঙ্গে মনে পড়ে গেল সুরেন্দ্রের। মাথা ঘুরতে লাগল, কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি, কিন্তু আনন্দানুভূতি লুপ্ত হ'ল না। কিছুটা প্রকৃতিস্থ হবার পর দেখলেন স্বপ্নদৃষ্ট দেবীমূর্তি আর মায়ের মূর্তি এক। এই দেখে সুরেন্দ্র সেন সবে সুরু করেছেন, মা অনেকদিন আগে স্বপ্নে আমি একটি মন্ত্র পাই—এই পর্যন্ত বলতেই মা সারদামণি অমনি বলে উঠলেন, কি, মিলছে না? ঠিকই মিলছে ত? মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে পাও না?

মহাযোগী গোরখনাথ

★ ★ ★ ★ ★ ★

সিদ্ধযোগী এবং কৌল অবধূত মৎসেন্দ্রনাথের সুযোগ্য শিষ্য গোরখনাথ মহাযোগী। ভারতের যে অঞ্চলে সাধনা করে তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম অনুসারে নাম হয় তার গোরখপুর। গোরখপুরের যোগী গম্ভীরনাথের যোগৈশ্চর্যের কথা আমরা এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডেই আলোচনা করেছি। এবার তাঁর বহু দূরতর পূর্বসূরীর কথা। এঁরা সবাই নাথ সম্প্রদায়ের লোক। এখন প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে যে যৌগিক ব্যায়াম অনুশীলনের রেওয়াজ হয়েছে—এই নাথ যোগীরাই তার আদি প্রবর্তক। শাস্ত্রে বলে একে হঠ্‌যোগ। নাথ যোগীদের তথাকথিত 'কায়াসিদ্ধি' লাভ করা যায় এর দ্বারা। হঠযোগের দ্বারা জরামরণহীন দিব্যদেহ লাভ করবার পর সাধক আত্মদর্শনের জন্য রাজযোগ সাধন করেন। পরম প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লাভ হয় নানা বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য।

মহাযোগী গোরখনাথ এ সবকিছুই লাভ করেছিলেন। তাঁর দুই একটা যোগৈশ্বর্যের কাহিনী এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে। গোরখনাথের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় হাজার বৎসর আগে, আর এ কাহিনীগুলি এমন অলৌকিক যে শুনে অনেকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু অবিশ্বাসই আসবে কেন, শাস্ত্রে যখন এই ধরণের অত্যাশ্চর্য যোগবিভূতির উল্লেখ আছে এবং হালের স্নিগ্ধ সাধক এবং যোগীদের মাঝেও এর অনেক কিছুর নিদর্শন মিলছে, তখন এ কাহিনীও নিছক গল্প কথা বলে উড়িয়ে দেবার সঙ্গত কারণ কই?

মৎসেন্দ্রনাথ, গোরখনাথ প্রভৃতি নাথপন্থী যোগীরা যে 'কায়াসিদ্ধি' লাভ করেছিলেন 'রসেশ্বর সাধনা' তারই এক প্রাচীন পন্থা। জরামরণহীন দিব্যদেহ বা 'রসময়ী তনু' আশ্রয় করে এই পন্থার সিদ্ধ যোগীরা জগতের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই সম্প্রদায়ের নেতা অল্লাম প্রভু এবং গোরখনাথের মধ্যে একবার নিজ নিজ পন্থার শক্তি পরীক্ষার এক সংঘর্ষ হয়। লোকমুখে গোরখনাথের খ্যাতি শুনে অল্লাম ঘুরতে ঘুরতে একবার গোরখপুরে এসে হাজির হ'ন। সেখানে কায়াসিদ্ধির ব্যাপার নিয়ে দুই যোগীর মাঝে ঘোরতর বিতর্ক সুরু হয়।

অল্লাম নিজ পন্থার গৌরব বাড়াতে রসেশ্বর দর্শনের গুণগানই শুধু করেন না, নাথ-সাধন-প্রণালীর নানা নিন্দাও তিনি করতে থাকেন। এতে গোরখনাথেরও চুপ থাকবার কথা নয়। তিনিও উত্তেজিত হয়ে সরোষে বলে ওঠেন, আচার্যবর, অনর্থক যুক্তিহীন কথা শুনতে আমি প্রস্তুত নই, তা ছাড়া মিছে তর্ক বিতর্ক ও নিন্দাবাদেরও প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বরং আসুন, নাথযোগীদের কায়াসিদ্ধি কি বস্তু তার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি।

বেশ, এ তো ভাল কথা, তাই আপনি দেখান।

গোরখনাথ বললেন, এই আমি আপনার সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকছি। আপনি ঐ তীক্ষ্ণধার খড়্গ দিয়ে আমায় আঘাত করতে থাকুন, সেই আঘাতে আমার এই সিদ্ধদেহের একটি লোমও যদি ছিন্ন হয়, তখন মেনে নেব সিদ্ধাচার্যরূপে গণ্য হবার কোন অধিকার আমি অর্জন করি নি।

দাঁড়ানো অবস্থায় গোরখনাথের গায়ে অল্লাম বারবার খড়্গাঘাত করতে লাগলেন, কিন্তু তাতে গোরখের সিদ্ধদেহের কোন তারতম্য ঘটতে দেখা গেল না, শোনা গেল শুধু আঘাতের আওয়াজ।

অস্ত্র ত্যাগ করে হো হো করে হেসে উঠলেন অল্লাম : নবীন নাথ-যোগী, স্বীকার করছি খড়্গাঘাতে তোমার একটি রোমও ছিন্ন হয়নি, ত্বকে একটু আঁচড়ও লাগেনি, কিন্তু ভায়া, খড়্গাঘাতের ফলে আওয়াজ হবে কেন ? এতে ত বেশ বুঝা গেল সংঘর্ষ হচ্ছে কোথাও। এ হবে কেন ? প্রকৃত যোগসিদ্ধ দেহ হবে আকাশের মত শব্দহীন, বিকার হীন। তোমার গুরু মৎসেন্দ্রনাথকে একবার জিজ্ঞাসা করো তোমার কায়াসিদ্ধি এখনও পূর্ণাঙ্গ হয়নি কেন ?

এরপর অল্‌লাম নিজের কায়াসিদ্ধি কত উচ্চস্তরের তা দেখানোর জন্য গোরখনাথকে খাঁড়া ধরতে বললেন। গোরখনাথ শাণিত অস্ত্র দ্বারা অল্‌লামের দেহে আঘাত হানলে তাঁর দেহের কোথাও যে শুধু কোন বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না তা নয়, আঘাতের ক্ষীণতম আওয়াজও কানে এল না। অল্‌লামের সিদ্ধ দেহ যেন একখণ্ড মহাকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

০ ০ ০ ০

উত্তর ভারতে গোরখ-শিষ্য ভর্তৃহরির মর্যাদা ছিল অপরিসীম।

পূর্বাশ্রমে ছিলেন তিনি পরমার বংশীয় রাজপুত, চন্দ্রাবৎ রাজ্যের অধীশ্বর। গোরখনাথের অধ্যাত্মজ্ঞান এবং যোগৈশ্বর্য-প্রভাবে রাজা ভর্তৃহরি কি করে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হ'লেন সে কাহিনী অতীব বিস্ময়কর।

গোরখনাথের সঙ্গে রাজার আগেও দু'একবার দেখা হয়েছে, তাঁর যোগৈশ্বর্য দেখে ভর্তৃহরি হতবাক্ হয়েছেন,— তার পরের কথা। রাজা মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। বনে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় দেখেন এক চিতাশয্যা। নিম্নশ্রেণীর একদল লোক তার পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। দেখে ঘোড়া থেকে নামলেন ভর্তৃহরি। শুনলেন পারধি জাতীয় একটি লোক বনে শিকার করতে এসে সর্পাঘাতে মারা যাওয়ায়—তার স্ত্রী পতির সঙ্গে সহমরণে যাবে তাই এই চিতা সাজানো হয়েছে। রাজার সামনেই চিতায়

অগ্নিসংযোগ করা হ'ল, উপস্থিত সকলের সামনে স্বামীস্ত্রীর দেহ ভস্মীভূত হ'ল।

প্রাসাদে ফিরে ভর্তৃহরি রাণী পিঙ্গলার কাছে এই বিস্ময়কর ঘটনাটি বিবৃত করে বললেন, দেখলে—নীচ জাতির গরীবের ঘরের মেয়ে অথচ স্বামীর উপর তার কি গভীর প্রেম! নির্বিকার চিত্তে স্বামীর চিতায় উঠে সে নিজের প্রাণ দিলে।

শুনে পিঙ্গলা বলে উঠলেন, শুনে রাখো, তোমার দেহান্ত ঘটলে আমিও এমনি করে আত্মবিসর্জন দেব,—লোকে প্রমাণ পাবে আমার স্বামীর উপর আমার কতটা ভালবাসা ছিল। আরও শুনে রাখো তোমার মৃতদেহ চোখে দেখা ত দূরের কথা, তোমার মৃত্যু সংবাদ আমার কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহ আহুতি দেব আমি চিতার আগুনে!

শুনে রাজা হেসে বললেন, যা'ক—এ নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার দরকার নেই: শীগগির মরছি নে আমি, তোমারও তাই তাড়াতাড়ি চিতায় ওঠার দরকার হচ্ছে না।

কিছুদিন পর আর একবার শিকারে বেরিয়েছেন রাজা। বনে গিয়ে হঠাৎ পিঙ্গলার সেদিনকার কথাটা মনে পড়ে গেল। ভাবলেন প্রিয়ার সঙ্গে একটা রসিকতা করাই যা'ক না! খবর পাঠিয়ে দিই শিকারে গিয়ে হিংস্র বাঘের হাতে আমার প্রাণ গিয়েছে। দেখা যা'ক পিঙ্গলা কি করে! প্রাসাদে ফিরে এ নিয়ে বেশ হাসি ঠাট্টা, মজা করা যাবে।

এই মিছে খবর পাঠানোর ফল হ'ল কিন্তু গুরুতর। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্র রাণী চিতা তৈরী করিয়ে স্বামীর নাম করে আত্মাহুতি দিলেন।

প্রাসাদে ফিরে এসে ভর্তৃহরি দেখেন রাণী যা বলেছিলেন তাই করেছেন। সব শেষ।

পতিপত্নী দুইজনেই পরস্পরকে গভীর ভাবে ভালবাসতেন।

রসিকতা করতে গিয়ে প্রিয়তমা পত্নীকে হারিয়ে রাজা একেবারে মুষড়ে পড়লেন। পিঙ্গলার চিতার পাশে বসে তিনি প্রথমে শোকে এবং নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করে অবিরলধারে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন, তারপর ধীরে ধীরে মনে জেগে উঠল এক নির্বেদ। পত্নীর চিতা স্পর্শ করে তিনি উচ্চারণ করলেন এক কঠিন শপথ বাণী : প্রিয়ে, আমার নির্বুদ্ধিতায়ই আমি তোমাকে হারালাম, তোমা'কে হারিয়ে রাজ্য-সুখ, রাজসিংহাসন আমার দুর্বিসহ, তাই এ সব কিছু ত্যাগ করে গ্রহণ করব আমি সন্ন্যাস।

ভর্তৃহরির এই রকম যখন মনের অবস্থা তখন আশ্চর্য কাণ্ড! হঠাৎ তাঁর সামনে হাজির হ'লেন মহাযোগী গোরখনাথ। স্নেহভরা কণ্ঠে তিনি ভর্তৃহরিকে বললেন, মহারাজ, আপনি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি, শোকের ভারে এমনি ভেঙে পড়া কি আপনার শোভা পায়। আত্মসংবরণ করুণ আপনি।

মহাযোগীকে সামনে দেখে ভর্তৃহরি উঠে তাঁকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করতেই দেখেন যোগীবরের হাতে রয়েছে একটি ছোট মাটির ভাঁড়। যোগীবর সেটা একটু উঁচুতে তুলে বললেন, মহারাজ, এতে রয়েছে নর্মদার পবিত্র বারি,—আসুন, গ্রহণ করে শান্ত হ'ন। বলতে না বলতে ভাণ্ডটি যোগীবরের হস্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

এ যেন এক মহাশোকাবহ ঘটনা, অতি প্রিয়জন বিয়োগের মতই দুঃসহ। গোরখনাথ মহাশোকার্ত হয়ে কাঁদতে সুরু করে দিলেন। তাঁকে থামায় কার সাধ্য?

ভর্তৃহরি ত কাণ্ড দেখে হতবাক্ : মহাশক্তিধর যোগী বলে যিনি সমগ্র ভারতে খ্যাত, একটি মৃৎভাণ্ড খোয়া যাওয়ায় তাঁর এমন দুর্দশা!

ভর্তৃহরি বললেন, যোগীবর আপনি স্থির হ'ন, এক্ষুনি এমনি দশবিশটা ভাঁড় আপনাকে আনিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু, প্রভু, অপরাধ নেবেন না, সবিনয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি এই সামান্য

ভঙ্গুর জিনিসটার জন্য আপনি এত অধীর হয়ে পড়লেন কেন?

রাণী পিঙ্গলার জন্যই বা আপনি এত অধীর হয়ে পড়েছেন কেন, মহারাজ?

সে কি, সে যে আমার পত্নী, এ রাজ্যের রাণী।

আপনার পত্নীই হ'ন আর রাজ্যের রাণীই হন এই মৃৎভাণ্ডেরই মত তিনি একটি আধার বই ত নয়। তা যেমন ভেঙে যায় তেমনি আবার গড়াও ত যায়! আপনি যেমন আমায় দশবিশটা মাটির ভাঁড় এনে দেবেন বলে আশ্বাস দিলেন, আমিও তেমনি আপনাকে পঁচিশটা রাণী এনে দিচ্ছি, এদের প্রত্যেকেই আপনার রাণী পিঙ্গলা।

—এই বলে গোরখনাথ কিছুটা মন্ত্রপূত জল চিতার উপর ছিটিয়ে দিতে সঙ্গে সঙ্গে অবিকল পিঙ্গলার মত দেখতে পঁচিশটা সুন্দরী নারী ভর্তৃহরির সামনে এসে দাঁড়ালেন। একের সঙ্গে অন্যের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। এদের মাঝে কোনটি তাঁর আসল পিঙ্গলা ভর্তৃহরি তা কিছুতেই নির্ণয় করতে পারলেন না। অবশেষে তিনি সকাতরে গোরখনাথের চরণে নিবেদন করলেন, প্রভু, আমি বুঝতে পারছি, আপনার মহত্বের সীমা পরিসীমা নেই, আমি বিষয়কীট, অন্ধ, দয়া করে আমার সত্যিকার পিঙ্গলাকে চিনিয়ে দিন—শ্রীচরণে এই আমার প্রার্থনা।

রাজার প্রার্থনা শুনে গোরখনাথ মন্ত্রপূত বারি আর একবার চারিদিকে ছিটিয়ে দিতে একটি বাদে আর সব নারী মূর্তি সেখান থেকে কোথায় মিলিয়ে গেল।

যোগীবর মৃদু হেসে বললেন, মহারাজ, তাকিয়ে দেখুন ইনিই হচ্ছেন আপনার সত্যিকার রাণী।

উপস্থিত লোকজন যোগীবরের এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত। পিঙ্গলা ধীর পদে এগিয়ে প্রথমে

W. Watson—The story of Rani Pingala—Indian Antiqueries, Page 215.

গোরখনাথ এবং পরে স্বামী ভর্তৃহরিকে প্রণাম করে করজোড়ে সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

যেগীবর এবার প্রসন্ন কণ্ঠে ভর্তৃহরিকে বললেন, মহারাজ, এবার আপনি আপনার রাণীকে নিয়ে প্রাসাদে যান।

গোরখনাথের এই অত্যাশ্চর্য যোগবিভূতি তখন ভর্তৃহরির দৃষ্টি ভঙ্গীতে ঘটিয়েছে আমূল পরিবর্তন। পূর্ব জন্মের শুদ্ধ সংস্কার বশে বিত্ত-বিভব-রাজপাট, প্রেমময়ী পিঙ্গলা সবই মনে হচ্ছে মায়ার খেলা। বুঝছেন পিঙ্গলার সুন্দর তনু আর যোগীবরের মৃৎভাণ্ডের মাঝে সত্যিকার কোন পার্থক্য নেই।

ভর্তৃহরি তখন করজোড়ে যোগীবরকে বললেন, প্রভু, আপনার কৃপায় আজ আমার চোখ খুলে গেছে। মোহকূপে আর আমি পড়ে থাকতে চাই নে, আপনি কৃপা করে আমায় দীক্ষা দিয়ে নাথযোগের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির পথে নিয়ে চলুন।

গোরখনাথ প্রথমে রাজী হ'ন নি, কিন্তু রাজা যখন কিছুতেই ছাড়েন না তখন বলেছেন, মহারাজ, দীক্ষা আমি আপনাকে দিতে পারি, কিন্তু তার আগে আপনাকে এক কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। এতদিন ভোগসুখে কাটিয়েছেন, বারো বৎসর আপনাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, উদর-পূর্তি করতে হবে ভিক্ষা অন্নে, পারবেন?

হ্যাঁ, প্রভু, নিশ্চয় পারব।

দাঁড়ান, আরও কথা আছে। প্রতি একাদশীর পরদিন রাজ-প্রাসাদে ভিক্ষা মাঙতে যাবেন, গিয়ে বলবেন, মা পিঙ্গলা, আমায় ভিক্ষা দাও।

ভর্তৃহরি এসব পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়ে মহাযোগী গোরখনাথের কৃপাপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। উত্তর ভারতের যোগী গায়ক ও সারঙ্গীদারেরা আজও—ভিক্ষা দে মাঈয়া পিঙ্গলে—বলে ভর্তৃহরির এ অদ্ভুত ভিক্ষার গান গেয়ে বেড়ায়।

চরণদাস বাবাজী

★ ★ ★ ★

চরণদাস বাবাজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রাইচরণ ঘোষ, যশোর জেলার নড়াল মহকুমার মহিষখোলা গ্রামের ঘোষ-বংশের ছেলে। এখনও বৈষ্ণব ভক্তদের মুখে শোনা যায় এর মুখের নাম-কীর্তনে পাষাণ গলতো।

মহিষখোলার ঘোষ-বংশ শাক্ত, তাই কুলরীতি অনুসারে শাক্ত মন্ত্রে এর দীক্ষাও হয়েছিল। দীক্ষা গুরুও তখনকার এক বিখ্যাত কৌল সাধক, নাম যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য।

শাক্ত বংশে জাত, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত রাইচরণ কি করে বৈষ্ণব সাধকে পরিণত হ'লেন তার মূলেও রয়েছে বেশ কিছুটা অলৌকিক কাহিনী।

সংসারে বিরক্তি জন্মেছে, মনে জেগেছে মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের প্রবল আকাংক্ষা, কিন্তু পথ খুজে পাচ্ছেন না তিনি। দিনরাত ভাবছেন কোন পথে যাবেন, কি করবেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন রাইচরণ, দেখলেন জগজ্জননী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, এত ভাববার কিছু নেইঃ তুমি ভবানীপুরে যাও, সেখানে গিয়ে আমার মূর্তির সম্মুখে বসে পুরশ্চরণ কর ;—তোমার সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

উত্তর বঙ্গে বহু তন্ত্রসাধকের সাধন ভূমি এই বিখ্যাত শক্তিপীঠ। পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপরে অপরূপ মহিমায় অধিষ্ঠিতা এখানে দেবীমূর্তী।

প্রত্যাদেশ শুনে রাইচরণ পদব্রজে বহু পথপ্রান্তর অতিক্রম করে এখানে এসে হাজির হ'লেন। তারপর—

সেদিন সূর্যগ্রহণ। দেবী-ভবানী মূর্তির সামনে বসে রাইচরণ জপ পুরশ্চরণ শেষ করেছেন এমন সময় হঠাৎ এক অনির্বচনীয় ভাবাবেশে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন: চোখ দুটি কপালে উঠেছে, বাক্‌শক্তিরহিত, সারা গা বেয়ে অবিরল ধারে ঘর্ম ঝরে পড়ছে। সমাগত এই লোকটিকে নিয়ে মন্দিরে সেদিন একেবারে হুলস্থুল পড়ে গেল।

দুই তিন ঘণ্টা পরে রাইচরণের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে তিনি চোখ মেলে চাইলেন।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভবানীপুর পীঠে থেকে সাধন-ভজন করতেন, তিনি রাইচরণের এই অবস্থা দেখে তাঁর সেবা যত্ন করলেন, তারপর রাইচরণ প্রকৃতিস্থ হ'লে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা, বলো ত এখন তুমি কেমন বোধ করছ?

বৃদ্ধের প্রশ্নে রাইচরণ শুধু এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন—কি এক হারানো অমূল্যধন যেন তিনি খুঁজছেন। কিছুক্ষণ পরে সখেদে বলে উঠলেন, এই ত এখানেই ছিলেন মা আমার, আবার এর মাঝেই কোথায় চলে গেলেন?

তুমি কার কথা বলছ, বাবা?

মা-জগজ্জননীর কথা।

এর পর বৃদ্ধের জিজ্ঞাসার উত্তরে উপস্থিত সকলে রাইচরণের মুখে যা শুনলে তাতে তাদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ভেতর দিয়ে রাইচরণ তাঁর অধ্যাত্মজীবনের এক অদ্ভুত নির্দেশ পেয়েছেন। মহামায়া স্বয়ং তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বলে গেলেন, বৎস তুমি সমুদ্র তীরে যাও, সেইখানে। তোমার অভীষ্ট পরম বস্তুর সন্ধান মিলবে। তোমার অধ্যাত্মসাধনার যিনি পথপ্রদর্শক হবেন, তিনি সেখানেই রয়েছেন। তাঁর কৃপায় অচিরে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

জগজ্জননীর মুখে এই কথা শুনে রাইচরণের দুই চোখ দিয়ে

পুলকাশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

কিন্তু রাইচরণের মনে তখন প্রশ্ন জাগল, কে তাঁর এই গুরু, আর তাঁকে মিলিয়ে দেবেই বা কে?

অন্তর্যামিনী জগন্মাতা তাঁর মনের কথা জেনে মধুর কণ্ঠে আবার তাঁকে বললেন, বাবা, এ নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না, তোমার কথা তিনি জানেন, তোমার জন্য তিনি সেখানে অপেক্ষা করে থাকবেন। নাম তাঁর শংকরারণ্য পুরী। পূর্বাশ্রম ছিল তাঁর খড়দহে, নাম ছিল তাঁর যোগেন্দ্র নাথ গোস্বামী। দীর্ঘ সুঠাম আকৃতি, দেখলেই তুমি তাঁকে চিনতে পারবে।

দেবী তাঁকে আরও জানালেন, শংকরারণ্য এক সন্ন্যাসী, কিছুদিন হ'ল কাউকে শিষ্য করবেন না বলে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু তোমার এতে ভয় পাবার কিছু নেই,—তোমার জন্য এ প্রতিজ্ঞা তাঁকে ভঙ্গ করতে হবে।

ভবানীপুর-পীঠে দেবীর এই প্রত্যাদেশ পেয়ে রাইচরণের আনন্দের অবধি রইল না। ভক্তি ভরে ইষ্টনাম জপ করতে করতে তিনি পুণ্যতোয়া সরযূ তীরে এসে উপনীত হ'লেন।

তারপর সুরু হ'ল নদীর তীরে তীরে নির্দিষ্ট গুরু খুঁজে বেড়ানো। মনে ভয়—দেখা পেলেও তিনি যদি কৃপা না করেন।

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন দৃষ্টি পড়ল এক সৌম্যদর্শন দিব্য-কান্তি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর দিকে। সরযুতে স্নান করে এক কাঠের কমণ্ডলু হাতে তিনি চলেছেন। রাইচরণ তাঁর দিকে একটু এগুতেই তিনি হাতছানি দিয়ে তাঁকে কাছে ডাকলেন: এসো, বাবা, এসো, তোমার জন্যই যে আমি অপেক্ষা করে আছি।

মহাপুরুষকে দেখেই এবং তাঁর কথা শুনেই রাইচরণের বুঝতে বাকী রইল না যে ইনিই মা-ভবানী-নির্দেশিত তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের চিহ্নিত কর্ণধার। রাইচরণ পরম ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

সরযূতীরে একটি ছোট বন, তারই ছায়াচ্ছন্ন নির্মল পরিবেশে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম। মহাপুরুষ ধীরে ধীরে এই আশ্রমের এক ভজন-কুটিরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণের জন্য তা অর্গলবদ্ধ করলেন। আশ্রমের গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে একটি তুলসী-মঞ্চ।

রাইচরণ মহাপুরুষদের পুনঃদর্শনের অপেক্ষা করছেন—এমন সময় এক তরুণ ভক্ত সেবক একটা জলের ভাঁড় হাতে রাইচরণের সামনে এগিয়ে এসে ভাঁড়ের জল দিয়ে তাঁর ধূলিমাখা পা দুটি সযত্নে ধুইয়ে দিলে। এরপর শিষ্যটি রাইচরণকে যে কথা বলতে লাগল তা শুনে রাইচরণের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না।

—কিছুদিন আগে যে সূর্যগ্রহণ গিয়েছে—এই সময় দীর্ঘকাল মহাপুরুষ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। ধ্যান ভাঙলে হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল—আঃ—কি ভাগ্যবান, কি ভাগ্যবান!

বাবা কার কথা বলছেন?—সেবক শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপুরুষ বললেন, শোন তবে—ভবানীপুর পীঠে বসে এক শুদ্ধসত্ত্ব সাধক পুরশ্চরণ করছিলেন। মহামায়া তাঁর উপর প্রসন্ন হয়ে আমায় এক সঙ্গে অনুগ্রহ এবং নিগ্রহ দুইই করলেন। আমায় অনুগ্রহ হল এই যে তিনি আমাকে তাঁর ঐশীসাধনের যন্ত্র হতে নির্দেশ দিলেন, আর নিগ্রহ হ'ল এই যে তাঁর জন্য আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আদেশ দিলেন। আমি আর কোন শিষ্য গ্রহণ করব না বলে সংকল্প করেছিলাম, কিন্তু জগজ্জননীর কৃপাধন্য এই সাধকের জন্য আমার সে সংকল্প ত্যাগ করতে হচ্ছে।

সরযূতে স্নান করে আসার পর রাইচরণকে তিলক বিভূষিত করা হ'ল, গলায় পরানো হ'ল কণ্ঠিমালা। এরপর মহাপুরুষ রাইচরণকে মন্ত্র দান করলেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, মন্ত্র কানে একবার প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে রাইচরণের সর্বসত্তা আলোড়িত করে দেখা দিল অশ্রু, কম্প, স্বেদ ও পুলক। নবদীক্ষিত শিষ্যের দেহে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার দেখে মহাপুরুষ তাঁকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করলেন,

তাঁর নয়নে তখন বিরামহীন প্রেমাশ্রুধারা।

বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হবার পর রাইচরণের নাম হ'ল চরণদাস বাবাজী।

কয়েক দিন পর গুরুজী তাঁকে বললেন, বাবা চরণদাস, অযোধ্যায় আর তোমার বেশি দিন থাকবার প্রয়োজন নেই, যা তোমার পাবার তা তুমি পেয়ে গেছ, এখন দেশে দেশে নগরে নগরে তুমি নামকীর্তন করে বেড়াও। এতেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, লোককল্যাণ হবে।

বিদায়ক্ষণে গুরু তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন, স্বয়ং মহাপ্রভু তোমার হৃদয়ে উদিত থাকবেন, আমার নির্দেশ রইল, সারা দেহমন—প্রাণ দিয়ে তুমি উচ্চস্বরে নাম কীর্তন করে বেড়াবে। এই হচ্ছে তোমার জীবনব্রত।

চরণদাস বাবাজীর এই ব্রত পালনের ফলে কত শুদ্ধসত্ত ভক্তের জীবন যে ধন্য হয়েছে, কত পাষণ্ড যে উদ্ধার পেয়েছে তার লেখা-জোখা নেই।

• • • •

গুরুর আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে নানা বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন করে নাম—কীর্তনে বহু ভক্তকে ধন্য করে বহু পাষণ্ডের জীবন পুণ্য করে বহু ভক্ত শিষ্য সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চরণদাস অবস্থান করছেন তখন মহাপ্রভুর জন্মভূমি, লীলাস্থল শ্রীধাম নবদ্বীপে।

মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন এবং ভজন কীর্তন সেরে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চরণদাসজী ফিরছেন তখন নিজের আবাসে। কীর্তনাঙ্গন থেকেই এক কুকুরী তাঁর সঙ্গ নিয়েছে। ভজন কীর্তন শুনে তার পরম আনন্দ দেখে চরণদাসজী তাঁর নাম রাখলেন 'ভক্তি-মা'। বাবাজীর আশ্রম কুটিরে এই মেয়ে কুকুরটি শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণবীর মতই সেবা ও মর্যাদা পেতে থাকে।

কিছুদিন পর রোগাক্রান্ত হয়ে এই কুক্কুরীর দেহত্যাগ ঘটল।

গঙ্গায় তার দেহ সমাধি দেবার পর বাবাজী মশায়ের অন্তরে এক অদ্ভুত অভিলাষ জাগল। তিনি ঠিক করলেন—ভক্তিমায়ের ধামপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে এক মহোৎসব করবেন।

এ মহোৎসব বৈষ্ণব-সমাজে চিরাচরিত সাধারণ মহোৎসব নয়। এর বৈশিষ্ট্য হ'ল এতে শুধু নবদ্বীপের বৈষ্ণব মণ্ডলীকেই নিমন্ত্রণ করা হবে না, নিমন্ত্রণ হবে ভক্তি মায়ের স্বজাতি নবদ্বীপের কুকুর-সমাজকেও।

বাবাজীর সাঙ্গোপাঙ্গেরা তাঁর এ প্রস্তাব শুনে ত হতবাক্ঃ কুকুরের শ্রাদ্ধ ত এমনিই এক অদ্ভুত ব্যাপার, তারপর আবার কুকুরদের ভোজন! লোকে শুনলে ত বলবে এ পাগলের কাণ্ড!

বাবাজী মশায় এ নিমন্ত্রণের ভার দিলেন একনিষ্ঠ ভক্ত নবদ্বীপ-দাসের উপর।

নবদ্বীপদাস শ্রীধামের সব মন্দির এবং আখড়ায় বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণের কাজ সেরে আরম্ভ করলেন কুকুরদের নিমন্ত্রণঃ পথে যেখানেই কোন কুকুরের সাক্ষাৎ পান বৈষ্ণবোচিত দৈন্য নিয়ে করজোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে তাদের কাছে নিবেদন করেন, আমাদের 'ভক্তি-মা' দেহ রেখেছেন। আগামী কা'ল তাঁর মহোৎসব। আপনারা যে যেখানে আছেন, সবান্ধবে এসে বড়ালঘাটের কাছে আমাদের গুরুদেবের আশ্রমে এসে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করবেন।

এদিকে ব্যাপার শুনে নবদ্বীপের বৈষ্ণব আখড়ার সাধুরা সব বেঁকে বসলেন, মহোৎসবে কুকুরের ভোজন হ'লে তাঁরা কেউ পঙ্গতে বসবেন না।

বাবাজীর ভক্ত শিষ্যেরাও বড় দুশ্চিন্তায় পড়লেনঃ গুরুজীর এ কি অদ্ভুত খেয়াল চেপেছে? কুকুরেরা মানুষের নিমন্ত্রণ কি করে বুঝবে? দু'দশটা কুকুর আহারের লোভে হয়ত নিমন্ত্রণ বাড়িতে এসে জুটতে পারে, নবদ্বীপের যত কুকুর সব নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য মধ্যাহ্ন-ভোজনে এসে বসবে, এ আবার কি উদ্ভট কল্পনা?

রাধেশ্যাম বাবাজী নামে নবদ্বীপের এক প্রতিষ্ঠাবান প্রধান বৈষ্ণব চরণদাসজীকে বড় স্নেহ করতেন। কুকুরের নিমন্ত্রণ এবং বৈষ্ণবদের ভোজনে আপত্তির কথা শুনে তিনি এসে চরণদাসজীকে তিরস্কার করতে লাগলেন, তুই যে পাগলামি করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুললি! ভোজনসভায় কুকুর এলে লোকে এমনি তাড়ায়, তাদের আবার কেউ নিমন্ত্রণ করে? আর নিমন্ত্রণ করলেই তাই বুঝে তারা সব আসতে যাচ্ছে!—নিমন্ত্রণ ত করেছিস, কই কোথায় তোর সেই নিমন্ত্রিত কুকুরের দল—বল ত?

শুনে বিচলিত হ'লেন না চরণদাসজী, আত্মপ্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বললেন, বাবা, আপনারাই ত বলে থাকেন, প্রভু সর্বঘটে বর্তমান, কুকুরের ঘটে তবে না থাকবার কারণ কি? ভক্ত প্রহ্লাদের জন্য স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করে নৃসিংহমূর্তিতে প্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন, সচেতন জীবদেহে প্রভুর লীলা কি প্রকট হতে পারবে না? নিতাই-চাঁদের লীলা সর্বত্র,—এ যদি সত্য হয় তবে জোর করে বলছি—আজ এই কুকুরসমাজ দিয়ে আমার রঙ্গিয়া নিতাই মানুষকে এক অপূর্ব রঙ্গ দেখাবেন।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল দলে দলে কুকুর এসে হাজির হচ্ছে মহোৎসব চত্বরে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, কুকুর দলের চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, মুখে একটি শব্দ নেই, সুসভ্য নিমন্ত্রিতের মত তারা সারিবদ্ধ হয়ে মহোৎসব প্রাঙ্গণে জমায়েত হচ্ছে। আর চরণদাস বাবাজী 'জয় নিতাই চাঁদের জয়' বলে তাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

প্রেমাবেশে চরণদাসজীর নয়ন ঢুলুঢুলু, দেহ টলমল। এই অবস্থায়ই তিনি কুকুরদের ভোজন এবং আপ্যায়নের নির্দেশ দিচ্ছেন। সুসভ্য অতিথির মত ভোজন শেষ করে কুকুরের দল একে একে নিঃশব্দে আঙিনা ত্যাগ করল।

সহস্র সহস্র দর্শক চরণদাসজীর অলৌকিক বিভূতি প্রত্যক্ষ করে

বিস্ময়াভিভূত। মহোৎসব প্রাঙ্গণে গগনভেদী নাম কীর্তন।

বৈষ্ণব আখড়ার যে সব বাবাজী এর আগে ভোজনে আপত্তি করেছিলেন তাঁদের মুখে আর রা নেই। চরণদাসজীর কাছে তাঁরা সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন এবং কুকুরের পঙ্গত শেষ হয়ে যাবার পর পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁরা মহাপ্রসাদ গ্রহণ করলেন। চারিদিকে উঠল চরণদাসজীর জয়জয়কার।

বৃদ্ধ রাধেশ্যাম বাবাজী এগিয়ে বড় বাবাজী মহারাজকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে বললেন, বাবা চরণদাস, তোর যে নিতাই চাঁদের উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এ আর আমি আগে ধারণা করতে পারিনি। আশীর্বাদ করি, তোর ভক্তিবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পা'ক, তোর সাধনা আরও সার্থক হয়ে উঠুক।

° ° ° °

কৃষ্ণনগরে এসে চরণদাসজী সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নগরকীর্তনে বেরিয়েছেন। শহরের এক প্রান্তে ভুবন মোহন মিত্রের বাড়ি। মিত্র মশায় ধীর গম্ভীর প্রকৃতির লোক, বিদ্যাবুদ্ধিতেও কিছুমাত্র কম নন। তিনি মনে মনে ভাবছেন—এই বাবাজী নাকি শক্তিধর অন্তর্যামী পুরুষ। তাই যদি হয় তবে আমার ইচ্ছা—ইনি অনাহূত হয়ে আমার কুটিরে এসে ঐ তুলসী মঞ্চের সামনে নাম কীর্তন করুন। এ ইচ্ছা যদি আমার পূরণ হয় তবেই বুঝব তিনি সত্যিকার অন্তর্যামী সমর্থ সাধক।

আশ্চর্যের ব্যাপার—কীর্তনের শোভাযাত্রা যে দিকে অগ্রসর হচ্ছিল অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সেদিক থেকে তার গতি পরিবর্তিত হ'ল। গতি এবার তাঁর বাড়ির দিকেই এবং দেখতে না দেখতে দলটি তাঁর বাড়ির অপরিসর অঙ্গনে ঢুকে তুলসীমঞ্চের কাছে উদ্দণ্ড কীর্তন সুরু করে দিল।

ছোট আঙিনা এবং তার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। এরপর এখানে আর যে কাণ্ডটি ঘটল তা আরও বেশি বিস্ময়কর। একটি

লোক ভাবাবেশে প্রমত্ত হয়ে কীর্তনমণ্ডলীর মাঝে প্রবেশ করলে, কণ্ঠে তার ঘনঘন মা-মা ডাক, বেশ আবেগময় উচ্চরবে। মাতৃনাম এবং নর্তন কুন্দনে সে চারিদিক কাঁপিয়ে তুললো।

কিছুক্ষণ এমনি কেটে যাবার পর সে হঠাৎ ভূমিতলে আছড়ে পড়ে গড়াতে গড়াতে বাবাজীর চরণ সান্নিধ্যে গিয়ে হাজির হল। এরপর অর্ধবাহ্যাবস্থায় চরণদাসজীর ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি চুষতে লাগল।

বাবাজী মশায় তখন স্থানুবৎ নিশ্চল, সমস্ত চৈতন্য যেন তাঁর কোন অপ্রাকৃত রাজ্যে উধাও। চক্ষুদুটি অর্ধনিমীলিত, রক্তবর্ণ।

অঙ্গনে সমবেত দর্শকেরা সবিস্ময়ে দেখছেন এক অলৌকিক দৃশ্য। তাঁরা দেখছেন ভাবাবিষ্ট মৃত্তিকাশায়িত ঐ লোকটির মুখের দুই কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে দুধের মত শুভ্র রসধারা।

আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবার পর লোকটি পুলককম্প্রকণ্ঠে বলতে লাগল, ক্ষুদ্র শিশু হয়ে মাতৃস্তন্য পান করবার এক তীব্র বাসনা জেগেছিল আমার মনে। মহাপুরুষের অলৌকিক কৃপায় সে বাসনা আমার আজ পূর্ণ হ'ল।

° ° ° °

১৯০৩ সালের পৌষমাস। বাবাজী মহারাজের প্রিয় শিষ্য নবদ্বীপদাস সেদিন মরোমরো। দারুণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত তিনি, সেদিন অবস্থা একেবারে চরমে উঠেছে। বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই কেউ আর দেখছেন না। চরণদাসজীর কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি যেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

কেউ রোগীর দুর্দশার কথা তাঁর কাছে উত্থাপন করলে তিনি উত্তর দেন, আমি কি জানি, নিতাইচাঁদের যা ইচ্ছা তাই হবে।

নবদ্বীপদাসের নাড়ী ক্রমে বসে যাচ্ছে। গুরুদেবের শ্রীমুখের দিকে চেয়ে ভক্ত শিষ্য এবার বিদায় নিতে চান। বাবাজী মহারাজ কিন্তু নির্বিকার, মাঝে মাঝে শুধু 'জয় নিতাই, জয় নিতাই' বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠছেন।

নবদ্বীপদাসের এদিকে শেষ সময় উপস্থিত। সেবকেরা এবার হতাশ হয়ে তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

অঙ্গনে তখন ভক্তদের উচ্চরবে নামকীর্তন চলেছে। বাবাজী মশায় এবার হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হয়ে ছুটে বাইরে এসে নবদ্বীপদাসকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সারা দেহটি তখন ভাবাবেগে থর থর করে কাঁপছে।

ভক্তেরা সব উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখলেন চরণদাসজীর দেহের স্পর্শ পেয়ে মৃতকল্প নবদ্বীপদাস ধীরে ধীরে চোখ মেললেন।

বাবাজী মহারাজ তখন প্রেমোন্মত্ত হয়ে কেবলি বলছেন,—'বোল নিত্যানন্দ, বোল নিত্যানন্দ', আর ভক্তেরা এদিকে নবদ্বীপ-দাসকে প্রাণ ফিরে পেতে দেখে উল্লাসে জোর কীর্তন সুরু করেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কীর্তন থামলে বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপদাসকে বললেন, যাও—এবার রজে গড়াগড়ি দিতে থাকো। নিতাইচাঁদই এবার তোমায় রক্ষা করলেন, এ কথা মনে রেখো।

নবদ্বীপদাসের মুখে ফুটে উঠেছে ক্ষীণ হাসির রেখা। তিনি উঠে বাবাজী মহারাজকে দণ্ডবৎ করে বলে উঠলেন, আমি বুঝি, দাদা—এ সব তোমারই কাজ, তোমার প্রেমশক্তির সীমা নেই,—ইচ্ছা হ'লে তুমি রাখতেও পার, আবার মারতেও পার।

ঐ দিন রাত্রেই কিন্তু বড় বাবাজী মশায়ের প্রবল জ্বর দেখা দিল, দারুণ ব্যথা। নিউমোনিয়ার তীব্র আক্রমণ। কবরেজ ডাকা হ'ল, কিন্তু রোগ নিরাময়ের অনেক চেষ্টা করেও তিনি কিছু করে উঠতে পারলেন না, বড় ভীত হয়ে পড়লেন তিনি, রোগ কমবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

বাবাজী মহারাজের যেখানে যে ভক্ত আছেন সবাইকে তাঁর পীড়ার খবর জানানো হ'ল। সংবাদ পেয়ে কলকাতা থেকে এক

বিশিষ্ট ভক্ত ছুটে এলেন, সঙ্গে আনলেন তিনি ওষুধের সঙ্গে নানা সেবা-পথ্যের উপকরণ। নানা রকমের ফলের সঙ্গে আচার, মোরব্বা ইত্যাদি আনতেও তিনি ভোলেন নি, গুরুদেবের কখন কি দরকার হয় বলা ত যায় না।

এদিকে বাবাজী মহারাজের পীড়া বেড়েই চলেছে, উপশমের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, শেষে একদিন বুকের ব্যথায় বড়ই কাতর হয়ে পড়লেন।

এই সময় গভীর রাত্রে যখন আর সবাই ঘুমিয়ে তখন বাবাজী মহারাজ হঠাৎ শয্যায় উঠে বসে সেবারত ভক্তটিকে বললেন, ওরে উপরে যে ছুটো হাঁড়িতে আচার আর মোরব্বা রয়েছে—তা নামিয়ে আন ত।

সেবক হাঁড়ি ছুটো নিয়ে এলে চরণদাসজী গম্ভীরভাবে তা থেকে সমস্ত আচার আর মোরব্বা বের করে ভোজন করতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে ভক্তটির ত চক্ষুস্থির। সংকটাপন্ন নিউমোনিয়া রোগীর এ কি অনাছিষ্টি কাণ্ড।

সাহসে কুলায় না তবুও সে মরিয়া হয়ে বললে, আজ্ঞে আপনার দেহটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না, কবিরাজ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, এ সময় এ কুপথ্য গ্রহণ কি আপনার ঠিক হচ্ছে?

বাবাজী মহারাজ নিতান্ত সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন, তা আমার শরীর ভাল না থাকলে আর কি হবে, নিতাইচাঁদ যে খেতে চাইলেন, তাঁকে ভোগ না দিয়ে কি পারি রে!

হাঁড়িতে আচার মোরব্বা যতটা ছিল থালার উপর নামিয়ে সবটাই চরণদাসজী উদরস্থ করেছেন, সুস্থ অবস্থাতেও তাঁকে কেউ কোনদিনই এত গ্রহণ করতে দেখে নি। খবরটা শিষ্যদের কানে গেলে তাঁদের আতঙ্কের অবধি রইল না।

এরপর ভোরে উঠেই বাবাজী মহারাজ বলে উঠলেন, শরীরে আর রোগ নেই আমার, আজ আমি অবগাহন স্নান করব।

শুনে শিষ্যেরা ভাবেন—কি সর্বনাশ। তাঁরা তখনই কবিরাজ ডেকে পাঠালেন। কবিরাজ এসে বাবাজীকে পরীক্ষা করে রীতিমত বিস্মিত হয়ে শিষ্যদের বললেন, তোমরা মিছিমিছি ভেবে মরছ, মহারাজের নাড়ীতে কফের চিহ্নমাত্র নেই, বরং এখন রীতিমত বায়ু বৃদ্ধিই ঘটেছে! এ অবস্থায় শীতল জলে স্নানেও আমি কোন আপত্তির কারণ দেখি না। কুপথ্য কি যাদুবলে যে মোক্ষম ওষুধে পরিণত হ'ল তা বলবার মত বিদ্যে আমার সত্যিই নেই।

° ° ° •

চরণদাসজী সেবার নীলাচল থেকে কেন্দ্রাপাড়ায় এসেছেন। এখানকার জমিদার শ্যামসুন্দর বাবু তাঁর পরম ভক্ত। বাবাজী মহারাজ তাঁরই গৃহে অবস্থান করছেন।

সেদিন বাবাজী মহারাজ তাঁর স্বজন-পরিবৃত হয়ে দোতলার ঘরে বসে আছেন এমন সময় কি জানি কেন হঠাৎ তিনি খুব ব্যগ্র ও চঞ্চল হয়ে 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ', বলে উচ্চস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন।

যে কৃষ্ণকে তিনি ডাকলেন সে হচ্ছে জমিদার বাড়ীর দারোয়ান —কৃষ্ণমান সিংহ।

সে তখন নীচের তলায় বসে তার সঙ্গীদের নিয়ে গল্প গুজব করছে। সকলে তখন ব্যস্তসমস্ত হয় তাকে বাবাজী মহারাজের কাছে হাজির করল।

চরণদাসজী তাকে দেখামাত্র বলে উঠলেন, না, বাবা কৃষ্ণ, এটা তোমার মস্ত ভুল। সত্যিকার মন্ত্রদাতা ত নিতাইচাঁদ। তার কাছে ত সবাই সমান। বরং দীনের উপরেই ত তাঁর বেশি, কৃপা, বেশি করুণা।

ব্যবাজীর মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল, আর সর্বাঙ্গে পুলক।

ব্যাপার কি জানবার জন্য সকলেই উদগ্রীব দেখে বাবাজী মশায় স্মিত হাস্যে প্রকৃত ঘটনাটি বিবৃত করলেন। বললেন—

কৃষ্ণমান তার বন্ধুদের কাছে বড় খেদ করে বলছিল, বাবাজী মহারাজ কেবল বড় লোকদের কানেই মন্ত্র দেন, আমার ত সহায়—সম্পদ কিছু নেই, সুতরাং ওঁর কাছে দীক্ষা পাবার সৌভাগ্য আমার হবে কি করে?

কৃষ্ণমানের মনিব বাবাজীর কাছেই ছিলেন, তিনি এই শুনে তাঁর দারোয়ানের প্রতি মহাক্রুদ্ধ হয়ে তাকে ধমকে উঠলেন, ব্যাটা, তোর সাহস ত বড় কম নয়, ওখানে বসে আর কি কথা বলাবলি করছিলি বল।

কৃষ্ণমান তখন কাঁদতে কাঁদতে বললে মু তলে বসে এই কথা কহুথিলি, অন্তর্যামী প্রভু তো সব্ জানি পারিলো, মু আউ কন কহিব।

° ° ° °

কলকাতায় থাকবার সময় চরণদাসজীর লোকাতীত শক্তির এক বিস্ময়কর পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটে এটা নিমতলা শ্মশান ঘাটে। বাবাজী মহারাজের প্রধান শিষ্য বৈষ্ণবাচার্য রামদাসজী এর যে মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন তাই সংক্ষেপে এখানে লিপিবদ্ধ করা যাচ্ছে।

একদিন ভোরে উঠেই চরণদাসজী ফণী আর রাধাবিনোদকে ডেকে বললেন, তোরা এখনি দৌড়ে গঙ্গাতীরে নিমতলার দিকে যা, আমরা আসছি।

বাবাজীর কথায় শিষ্যদ্বয় তখনই ছুটে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বাবাজী মহারাজ সদল বলে ঘাটে গিয়ে হাজির হলেন। এরপর তিনি শিষ্য দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওরে, তোরা এখানে আসবার সময় পথে কি দেখলি?

আজ্ঞে, দেখলাম একদল হিন্দুস্থানী লোক একটা স্ত্রীলোকের শব নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছে।

বাবাজী মশায় ব্যগ্র হয়ে বললেন, তোরা এখনি গিয়ে ঐ

শবদাহ বন্ধ করা দেখি, আমি না যাওয়া পর্যন্ত যেন সৎকার করা না হয়।

শিষ্য দু'জন ছুটে গিয়েই সেই ব্যবস্থাই করলেন। এদিকে চরণদাসজী স্নানাদি সেরে শ্মশানে পৌঁছে দেখেন মৃতার আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁরই প্রতীক্ষায় রয়েছে। ভক্তদের মুখে তারা শুনেছে—এই বৈষ্ণব মহাপুরুষ মহাশক্তিধর, শুনে তাদের মনে আশা হচ্ছে এঁর কৃপায় অলৌকিক কাণ্ড কিছু ঘটে যেতে পারে, মৃতা হয়ত প্রাণ ফিরে পাবে।

মৃতার দেহটি চিতায় উঠানো হয়েছিল, বাবাজী মহারাজের নির্দেশে সেটি চিতা থেকে নামিয়ে তাঁর সামনে রাখা হ'ল। বাবাজীর নির্দেশে তাঁর দলবল শবের চারিচিকে উদ্দণ্ড নাম কীর্তন সুরু করলেন, আর চরণদাসজী মৃতা স্ত্রীলোকটির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করে ভাবাবিষ্ট হয়ে অস্ফূট স্বরে নাম গান করতে লাগলেন।

প্রায় আধঘণ্টা এমনি করে কেটে যাবার পরে বাবাজী মহারাজ মৃতার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি ধরে 'জয় নিতাই' বলে বেশ জোরে এক ঝাঁকুনি দিলেন সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকটি অমনি চোখ মেললে।

বাবাজী মহারাজ তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, ইয়ে সব আদমী-য়োঁকে আপ পহচান্তে হেঁ?

স্ত্রীলোকটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালো।

এক বড় সাধু এক মৃতা স্ত্রীলোককে প্রাণদান করেছেন—এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ঘাটে সেদিন বহু নর নারীর ভিড় জমল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে যাবার পর স্বেচ্ছাময় মহাপুরুষ এই লীলা খেলার উপর হঠাৎ এক বিষাদান্ত যবনিকা টেনে দিলেন। এতক্ষণ স্ত্রীলোকটির যে বৃদ্ধাঙ্গুলি তিনি ধরে রেখেছিলেন তা তিনি ছেড়ে দিলেন, সঙ্গেসঙ্গে স্ত্রীলোকটি একেবারে চিরতরে নয়ন মুদ্রিত করল। সারা দেহের কোথাও আর প্রাণের চিহ্ন রইল না।

মৃতার আত্মীয়-স্বজনেরা বাবাজী মহারাজের কাছে আর্তস্বরে কাকুতিমিনতি জানাতে লাগল। বাবাজী স্থানত্যাগের জন্য উঠে দাঁড়ালে মৃতার স্বামী তাঁর চরণতলে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, বাবা, কৃপা করে তা আবার ফিরিয়ে নিচ্ছেন কেন? দোহাই আপনার, একে বাঁচিয়ে দিন।

বাবাজী মশায় শান্ত স্বরে বললেন, বাবা মহাপ্রভু নিজে যা করেন নি, আমাদের যে তা করতে নেই। তিনি ইচ্ছা করলে কি শ্রীবাস পণ্ডিতের ছেলেকে বাঁচাতে পারতেন না? নিশ্চয়ই পারতেন! কিন্তু তা তো তিনি করেন নি, কারণ বিধির বিধান রদ করলে তাঁকে অমর্যাদা করা হয়। নিতাইচাঁদেরও তা অভিপ্রেত নয়। তবে নামশক্তির বলে যে মৃতের দেহেও প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারে, কৃপা করে গঙ্গা তীরে আজ তাই সকলকে দেখালেন!

ｏ ｏ ｏ ｏ

চরণদাস বাবাজী কয়েক দিন কৃষ্ণনগরে কাটিয়ে দিগনগরে এসেছেন। এখানে এসে কথায় কথায় শুনলেন একটা পুরানো বড় বটগাছ আছে এখানে, অনেকেই তার নীচে ভক্তিভরে পূজা দেয়। কিন্তু ইদানীং গ্রামবাসীদের মনে একটা মনস্তাপের কারণ ঘটেছে। পাশেই বহু মুসলমানের বাস। তাদের কয়েকজন এই গাছের কতকগুলি ডালপালা কেটেছে। প্রতিবাদ করতে গেলে তারা বলে, গাছ পাথর কখনও ঠাকুর দেবতার আস্তানা হয় নাকি? অমনি বললেই হ'ল?—প্রমাণ দাও তবে মানব। নইলে গাছের গোড়া শুদ্ধ একদিন কেটে ফেলবো।

শুনে চরণদাসজী বললেন, বাবা, আপনারা আপনাদের প্রভুকে ডাকুন, অন্যায়ের প্রতিবিধান শুধু তাঁরই হাতে।

পরদিন ভোরে চরণদাসজী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দিনের মত নগর-কীর্তনে বেরুলেন। বহু ভক্ত গ্রামবাসীও এ কীর্তনের

দলে যোগ দিল। পুলকাঞ্চিত দেহে অর্ধনিমীলিত নেত্রে বাবাজী মহারাজ সদলবলে এগিয়ে চলেছেন যেন এক দিব্য প্রেরণায়।

চলতে চলতে এক সময় দেখা গেল প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় তিনি তাঁর দলটি নিয়ে মুসলমানপল্লীর মোড়ল হারুমণ্ডলের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছেন। কীর্তনের মধুর ধ্বনিতে মুহূর্তের মাঝে মণ্ডলের উঠানে ভাবতন্ময় এক দিব্য পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। হঠাৎ বাবাজী মশায় হারুমণ্ডলের দিকে চেয়ে এক হুঙ্কার দিয়ে তাঁকে কীর্তনে আহ্বান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত হারুমণ্ডল কীর্তনদলে যোগ দিয়ে উদ্দণ্ড-নৃত্য সুরু করল। প্রেমানন্দে সে আত্মবিস্মৃত। ভাবে মত্ত হয়ে সে ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগল। এরপর বাবাজী মহারাজ তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে তার কানে নাম প্রদান করলেন।

এরপর প্রেমাবিষ্ট বাবাজী নৃত্য করতে করতে সেই প্রাচীন বটবৃক্ষটির দিকে এগিয়ে গেলেন। বৃক্ষটিকে ঘিরে ঘিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলল তুমুল কীর্তন।

হঠাৎ দর্শকমণ্ডলীর চোখে পড়ল এক অলৌকিক দৃশ্য। গাছের ডালপালা আর পাতা যেন আর জড়বস্তু নয়, নামগুণে হয়ে উঠেছে তারা চৈতন্যময়, কীর্তনের তালে তালে নৃত্য সুরু করছে তারা। তা ছাড়া পাতাগুলি থেকে স্নিগ্ধ জলকণা ঝরে পড়ছে।

বাবাজী মহারাজের এই অদ্ভুত কীর্তনলীলার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে হিন্দু-মুসলমান বহু লোক এল তা দেখতে।

অবিশ্বাসী দুষ্টলোকের কোনকালে কোথাও অভাব থাকে না। নানা জনে নানা সন্দেহ এবং কূটতর্ক উঠাল। কেউ বলে বড় বাবাজী প্রেত-বশীকরণ মন্ত্র জানেন, তাই গাছের ডালপালা পাতা আন্দোলিত হচ্ছে, কারো সন্দেহ বাবাজীর কোন চেলা গাছে লুকিয়ে থেকে এই কর্মটি করছে।

বাবাজী মহারাজের সাধারণতঃ রাগতে দেখা যায় না,—কিন্তু এ

সব কথা তাঁর কানে এলে তিনি ক্রোধে গর্জে উঠলেন : কি, নাম শক্তিতে সন্দেহ! নিজের উপর বর্ষিত কটূবাক্য, লাঞ্ছনা তিনি অক্লেশে সইতে পারেন, কিন্তু এ যে শাস্ত্র, গুরু এবং নামের উপর অশ্রদ্ধা তাচ্ছিল্য।

বাবাজী মশায়ের নির্দেশে গ্রামে গ্রামে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে দেওয়া হ'ল চরণদাস মহারাজ দিগনগরের প্রাচীন বটগাছের নীচে কীর্তন-যজ্ঞ করবেন। শুনে হাজার হাজার লোক এল তা দেখতে। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখলে এবারও সেই আশ্চর্য কাণ্ড! কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নামের যাদুমন্ত্রে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা পত্র যেন সচেতন মানুষ ভক্তের মত প্রেমানন্দে তালে তালে নাচছে।

সন্দেহকারীরা পর্যবেক্ষণের জন্য গাছের ডালে ডালে অনুসন্ধানকারী লোক চড়িয়ে দিলে। দেখা গেল কেউ কোথাও নেই।

এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বাবাজী মহারাজের এই নামকীর্তন চলে, আর প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার লোক অবাক বিস্ময়ে ভক্তিগদগদচিত্তে দেখে অচেতন ডালপালার এই প্রেমনৃত্য।

বাবাজী মশায়ের মাহাত্ম্য দেখে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে বাবাজী মশায়ের অনেক ভক্ত জুটে গেল। বাবাজী মহারাজ সবাইকে দেখে বললেন, ছাখো আমি এই বৃক্ষের নামকরণ করে গেলাম কল্পতরু। এর মূলে তোমরা ফুল গঙ্গাজল দেবে, ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাবে, এতে তোমাদের অভীষ্ট লাভ হবে, মঙ্গল হবে।

• • • •

চরণদাসজী তখন কলকাতার উপকণ্ঠে বাস করছিলেন। ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন এমন সময় এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এসে হাজির হ'লেন সেখানে। নাম তাঁর শ্রীদীনবন্ধু কাব্যতীর্থ, বেদান্তরত্ন।

নানা তত্ত্ব আলোচনার পর বাবাজী মহারাজের কীর্তন শুরু হ'ল। মুগ্ধ শ্রোতাদের মাঝে ভাবাবেগের জোয়ার এসে গেল, সেই জোয়ারে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সত্তাও একেবারে ডুবে গেল।

কীর্তনের শেষে অর্ধবাহ্যাবস্থায় গলদশ্রুলোচনে বাবাজীর চরণ ধরে তিনি মিনতি করে বললেন, বিদ্যার বড় অভিমান ছিল আমার, আজ তা গেল, আমি পাপী, কৃপা করে আমায় মন্ত্র দিয়ে আপনি উদ্ধার করুন।

কাব্যতীর্থকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করে বাবাজী মহারাজ তখনই তাঁর কানে মন্ত্রপ্রদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নবদীক্ষিত শিষ্যের দেহে দেখা দিল অশ্রু কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার। শুধু তাই নয়, ভাবাবেগে তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন।

সেদিন ত কাব্যতীর্থ মশায়ের এই অবস্থা গেল, পরের দিন পূর্বাভ্যাসমত তাঁর মনে জেগে উঠল এক সংশয়ঃ বাবাজীর কাছ থেকে যে মন্ত্র পেলাম আমি তাতে যে ব্যাকরণের দোষ রয়েছে! তাঁর এই সন্দেহের কথা দুই একজন পরিচিতের কাছে তিনি প্রকাশ করেও ফেললেন।

কয়েক দিন পরের কথা। চরণদাসজীর আসরে কাব্যতীর্থ মশায় এসে হাজির হয়েছেন, কিন্তু অবস্থা স্বাভাবিক নয়, মুখমণ্ডল আরক্তিম, নয়ন ঢুলু-ঢুলু, দেহ কম্পমান।

বাবাজী মহারাজের চরণ ধরে তিনি বালকের ন্যায় কেঁদে উঠলেনঃ প্রভু, আমি ঘোর পাতকী। বিদ্যাভিমানে মত্ত হয়ে আমি গৌরমন্ত্রের শুদ্ধতায় সন্দেহ করেছিলাম। তার ফলে আমার খুব শিক্ষা হয়েছে।

সমবেত ভক্তেরা কি শিক্ষা হ'ল শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব!

কাব্যতীর্থ মশায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে চললেন, কাল রাত্রে স্বপ্নে আপনি রোষকষায়িত নেত্রে আমার সামনে হাজির হয়ে বলছেন, মূর্খ দু'পাতা পড়ে তুই বিদ্যামদে মত্ত হয়েছিস? প্রভু নিত্যানন্দের

মুখনিঃসৃত মন্ত্রের উপর তোর সন্দেহ, হতভাগা, এত বড় তোর স্পর্ধা, এত অহংকার এই বলে আমার গণ্ডদেশে কৃপাদন্ত আপনি প্রয়োগ করেছেন, এই দেখুন তার চিহ্ন !

উপস্থিত সকলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গণ্ডে চপেটাঘাতের শাসনচিহ্ন ।

° ° ° °

পুরীর ঝাঁঝপিটা মঠের বিগ্রহ শ্রীরাধাকান্তের সেবার ভার ঘটনাচক্রে নিতে বাধ্য হয়েছেন চরণদাসজী। প্রভু রাধাকান্তজী অবশ্য নিজের সেবার ব্যবস্থা নিজেই করে নিচ্ছেন। ভোগরাগ বেশভূষার ব্যবস্থা নেপথ্যের কোন অদৃশ্য শক্তিবলে আপনি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু একটি জিনিসের অভাব বড় বাবাজীর মনে সদাই পীড়া দিচ্ছে : শ্রীবিগ্রহের হাতে বাঁশীটি নেই। চরণদাসজীর মনে গভীর দুঃখ। কেবলই ভাবেন কি করে একটা মনোহর বাঁশীর যোগাড় করা যায়। তাঁর মনের দুঃখ ঘুচাতে রাধাকান্তজীকে শেষে নিজেই ভিক্ষায় বেরুতে হ'ল।

সেদিন ভোরে ঝাঁঝপিটা মঠে মংগল আরতির বাজনা বেজে উঠেছে, ভক্তেরা সব করজোড়ে শ্রীবিগ্রহের সামনে এসে দাড়িয়েছেন এমন সময়ে অপরিচিত এক সাধু দীন ভাবে অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। মুখে তাঁর ভক্তি ও আর্তির চিহ্ন, নয়নে অশ্রু।

আরতি শেষ হয়ে গেলে শ্রীবিগ্রহের সামনে একটি দিব্যসুন্দর বাঁশী রেখে প্রেমগদগদ কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, দয়াময়, তোমার কৃপার অন্ত নেই। তুমি নিজেই আমার কাছে বাঁশী ভিক্ষা চেয়েছ, আজ এটা গ্রহণ করে এ দাসের কৃতার্থ কর, প্রভু।

এরপর চরণদাস বাবাজীর পদতলে বসে তিনি যে কাহিনী শুনালেন তা শুনে শ্রোতাদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। সাধুটি রামাইতপন্থী, থাকেন পুরীধামের মাটিমণ্ডপসাহী অঞ্চলে। প্রতিদিন

তিনি গোপাল সেবা করেন, গোপলই তাঁর প্রাণ। ভাল কিছু জিনিস দেখলেই তিনি তাঁর গোপালের জন্য নিয়ে আসেন। প্রায় বছরখানেক হ'ল তিনি তাঁর গোপালের জন্য অতি সুন্দর এক বাঁশী তৈরী করিয়ে রেখেছেন। তাঁর বড় অভিলাষ তাঁর গোপাল নয়নাভিরাম বেশে তাঁকে দেখা দিয়ে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়িয়ে এই বাঁশীটি শ্রীহস্তে ধারণ করেন।

ইষ্টদেবের এমন এক কৃপারই প্রতীক্ষা করে ছিলেন তিনি, তাই বাঁশীটি ঝুলুঙ্গিতেই রাখা ছিল।

সাধুটি বললেন, গতকাল রাত্রে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন, হঠাৎ কে যেন তাঁকে এক ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলে। তাকিয়ে দেখেন নয়নাভিরাম ভঙ্গীতে কৃষ্ণজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। প্রভু তাঁকে বলছেন, আরে, ঘরমে বাঁস্থরী রাখ কর কেঁও মনমে দুঃখিত হো রহে হো? তুম বংশী তো মুঝে দে দো।

সাধু বললেন, আপ কওন হ্যাঁয়। কাঁহা রহতে হেঁ?

উত্তর হ'ল মেরে নাম রাধাকান্ত হ্যায়, তুম নেহী জানতে হো? ম্যঁয় তো ঝাঁঝপিটা মঠমে রহনেওয়ালে হ্যায়।

রামাইত সাধুটি ভোরে উঠেই তাই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন রাধাকান্তজীকে বাঁশীটি দিতে।

° ° ° °

ঝাঁঝপিটা মঠেরই আর একবারের কথা।

মঠে সেদিন টাকা পয়সা আহার্য কোন কিছুরই যোগাড় নেই। ললিতাসখী ও অন্যান্য ভক্ত শঙ্কিত হয়ে চরণদাস মহারাজকে এ কথা নিবেদন করলেন।

চরণদাসজী নির্বিকার ভাবে বললেন, বাজার করতে হবে, অথচ হাতে কানাকড়িও নেই—তা এ কথা আমায় জানতে এসেছ কেন? যার সংসার তাঁকে জানাও। প্রভু নিতাইচাঁদের কাছে নিবেদন করতে পারলে না?

উত্তরে ললিতাসখী বললেন, আমরা প্রত্যক্ষ ছেড়ে অনুমানকে কোথায় খুঁজতে যাব? বেশ তো আপনার যদি তাই ইচ্ছা হয় ত একবার বলে দিন না কোথায় কেমন করে আমাদের বক্তব্য পেশ করবো।

বেশ ত মন্দিরে গিয়ে আমার নাম করেই ঠাকুরকে বলো তিনি বলতে পাঠালেন—সংসারে আপনার দু'বেলা চার পাঁচ শো লোকের পাতা পড়ে, অথচ বাজার খরচের কিছু নেই, আপনার সংসার, আপনি যা হ'য় করুন।

বাবাজী মহারাজের নির্দেশ মত ললিতাসখী শ্রীবিগ্রহের সামনে গিয়ে ঐ সব কথাই নিবেদন করলেন, কিন্তু মনের শংকা গেল না কিছু, চোখেমুখে অপ্রসন্নতার ছাপ। ভাবছেন বাবাজী মশায় যদি এমন সব কিছুতে উদাসীন থাকেন তা হ'লে এ বিরাট মঠের ব্যয়, অতিথি অভ্যাগতদের সেবা চলবে কি করে?

এর কিছুক্ষণ পর ললিতাসখীর নজরে পড়ল অপরিচিত একটি লোক অতি দীনভাবে যুক্তকরে বাবাজী মহারাজের সামনে বসে, আর তার সামনে শতাধিক টাকা থাক্ করে সাজানো। নবাগত ভদ্রলোকটি যুক্ত করে বাবাজী মহারাজকে বলছেন, প্রভু, আমার একান্ত সাধ এই টাকাটা মঠের বৈষ্ণব ভক্ত এবং কাঙালীদের জন্য ব্যয় করা হ'ক।

এই কথা বলেই ভদ্রলোক চরণদাসজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

বিস্ময়বিমূঢ় ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ললিতাসখী এবার বাবাজী মহারাজের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর সখেদে বললেন, আজ্ঞে, আমি কিন্তু আপনার ঐ কথাগুলো শ্রীবিগ্রহের কাছে তেমন আন্তরিকতা দিয়ে বলি নি, বলতে বলেছেন তাই বলেছি। আপনি এ ব্যাপারে উদাসীন দেখে বেশ একটু রাগও হয়েছিল আমার মনে, কিন্তু কি আশ্চর্য তাতেও ত প্রভুর কৃপার কিছু কমতি দেখলাম না।

চরণদাসজী স্মিতহাস্যে বললেন, আমার নিতাইচাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু। আর এবার ভেবে দেখ হেলাফেলায় বললেও যখন তাঁর এমন কৃপা লাভ হয় তখন আন্তরিক ভক্তিবিশ্বাস নিয়ে বললে কত কি না হতে পারে!

° ° ° °

বরানগরে বাস করবার সময় ভাবাবেগে তার একবার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখা যায়। কি এক অদ্ভুত খেয়াল হয় তাঁর—ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সোনার ঘড়ি, চেন, আংটি ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

শিষ্য কাব্যতীর্থ মশায় এ সব দেখে মনে মনে ভাবছেন বাবাজী মশায়ের এ পাগলামি কবে থামবে কে জানে? এত সব দামী দামী জিনিস তিনি অযথা নষ্ট করছেন, তা ছাড়া এ দেখে লোকেই বা কি ভাবে?

বাইরে উন্মত্ত ভাব থাকলেও কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এ মনোভাব তাঁর অজানা থাকলে না, কাব্যতীর্থের দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন, কি হে কাব্যতীর্থ, এতগুলি মূল্যবান জিনিস খোয়া গেল, তাই মনে বড় দুঃখ হচ্ছে—না?—আচ্ছা!

এই বলেই বাবাজী মহারাজ ছুটে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিলেন, এর পর যখন উঠে এলেন তখন দেখা গেল—এ যাবৎ যে সব কিছু পুকুরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সে সবই তিনি একসঙ্গে তুলে এনেছেন।

বাবাজী মশায় এর আগে জিনিসগুলি তাঁর খেয়ালখুশিমত পুকুরে ফেলেছেন, কোন এক জায়গায় ত ফেলেন নি, আশ্চর্য যে উঠাবার সময় একটি জায়গা থেকেই তিনি সেগুলি তুলে আনলেন।

দেখে ভক্ত শিষ্যদের বিস্ময়ের অন্ত রইল না।

° ° ° °

উড়িষ্যার গ্রামে বাবাজী মহারাজ সেবার নামসুধা বিতরণ করে বেড়াচ্ছেন। একদিন ভোরে উঠেই আনন্দোদ্বেল কণ্ঠে

সঙ্গীদের বার বার বলতে লাগলেন, আজ বড় শুভদিন হে, বড় আনন্দের দিন।

সঙ্গী ভক্তেরা কৌতূহলী : প্রভু, আজ এ কথা বলছেন কেন আপনি, আপনার পাশে থাকতে পারলে সকল দিনই তো আমাদের শুভ, মঙ্গলময়, আনন্দের। তবে নতুন করে আবার কি আনন্দের কারণ ঘটবে ?

শুনে বাবাজী মুখ টিপে একটু হেসে বললেন, এখন ভাঙছি না, তবে জেনে রাখো আজ সবারই বড় আনন্দের দিন।

মধ্যাহ্ন কীর্তনের পর বাবাজী মহারাজ সদলবলে বসে বিশ্রাম করছেন এমন সময় বড় বড় দুটি চাঙাড়ি নিয়ে এক বাহক এল তাঁদের সামনে। চাঙাড়িতে জগন্নাথদেব ও আরও কয়েকটি বিগ্রহের মহাপ্রসাদ। শুধু এই নয় একটু পরেই দেখা গেল কাছাকাছি নানা জায়গা থেকে ভারে ভারে বিগ্রহের নানা প্রসাদান্ন আসছে।

আগে কেউ এ বিষয়ের কিছু জানে না, আর আগে থেকে এর জন্য ব্যবস্থাও কিছু করা যায় নি।

আশ্চর্য ব্যাপার নানা দিকের মঠ ও মন্দির থেকে ভোগপ্রসাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই যেন চরণদাসজীর অস্থায়ী আস্তানায় এসে পৌঁছল।

বাবাজী মহারাজ আনন্দে অধীর : নিতাইচাঁদের কি অপার কৃপা, কি অসীম করুণা! ভাবোদ্দীপ্ত হয়ে নানা ভঙ্গিতে তিনি প্রাসাদের সামনে নৃত্য করতে লাগলেন।

বিখ্যাত বাবাজী মহারাজ এ অঞ্চলে এসেছেন শুনে আশেপাশের মঠ মন্দির থেকে না হয় প্রসাদ আসতে পারে, কিন্তু সুদূর নীলাচল থেকে জগন্নাথের প্রসাদ এল কি করে ?

কৌতূহলী ভক্তদের নানা প্রশ্নের উত্তরে বাহকের মুখ থেকে শোনা গেল কা'ল জগন্নাথদেবের শিঙ্গার ভোগ হয়ে যাবার পর এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ বড় দেউলের এই বাহকের কাছে এসে তাকে দু'টো

টাকা দিয়ে বলেন, ভাই, তুমি এ দুটো চাঙ্গারি যত তাড়াতাড়ি পার চরণদাস বাবাজীর কাছে পৌঁছে দাও। দক্ষিণের গ্রামগুলিতে তিনি কীর্তন করে বেড়াচ্ছেন। কোন ভাবনা নেই তোমার, ওদিকে গিয়ে একটু খোঁজ করলেই তাঁকে পাবে।

ঠাকুরের এই কৃপার কাহিনী শুনে বড় বাবাজীর দুই চোখ দিয়ে অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

রাজা রামকৃষ্ণ

★ ★ ★ ★ ★ ★

প্রসিদ্ধ শাক্ত সাধক রাজা রামকৃষ্ণ স্বনামধন্যা রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র।

ভবানীপুর পীঠে সেবার রামনবমী উৎসবের দিন রাজা রামকৃষ্ণ সাড়ম্বরে পূজার আয়োজন করেছেন। দেবী বিগ্রহের অঙ্গেও যেমন নানা মহামূল্য আভরণ, রাজপুরীর মহিলারাও তেমনি মূল্যবান বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন।

অমাবস্থার নিশীথরাত্রে মহাপূজা। তখনও কিছু বিলম্ব আছে। মাতৃভক্ত রাজা রামকৃষ্ণের আজ আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই, প্রেমানন্দে মত্ত হয়ে তিনি উদাত্তকণ্ঠে স্বরচিত গান ধরেছেন—

ভবে সেই সে পরমানন্দ

যেজন পরমানন্দময়ীরে জানে....

মাতৃনামরসে বিভোর হয়ে কুঠিবাড়ির ছাদে বসে তিনি গানের বিভিন্ন পদগুলি বার বার গেয়ে চলেছেন, নয়ন থেকে অবিরল ঝরে পড়ছে প্রেমাশ্রুর ধারা।

হঠাৎ সামনের বন থেকে উঠল আতঙ্ককর হারে রে রে রব। কোন দুর্ধর্ষ দস্যুর দল আজ উৎসবের দিন বুঝে মন্দির লুঠ করতে এসেছে। তারা জানে এদিনে মন্দিরের সিন্দুকে জমবে অনেক টাকা, তা ছাড়া দেবীবিগ্রহ এবং রাজপুরীর মহিলাদের দেহে যে অলংকার থাকবে তার মূল্যও লক্ষ টাকার কম হবে না।

সম্মিলিত উচ্চকণ্ঠে হারে রে-রে-রব শুনে রাজা রামকৃষ্ণ যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন তাঁর চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য : অদূরে বনের সামনে ডাকতেরা মশাল হাতে একবার এগিয়ে আসছে আবার

পরক্ষণেই পিছিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের রক্ষীর সংখ্যা ত বেশি নয়, তবে কিসের বাধায় তারা বার বার এমন পিছু হঠে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই রাজার নজরে পড়ল ডাকাতরা মহা ভীত হয়ে এবার উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল।

ডাকাতরা সেরাত্রে মন্দির আক্রমণ করবার চেষ্টা করতে গিয়েও কেন পারলে না—কেন তাদের উর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে যেতে হ'ল—মন্দিরে সমবেত আর কেউই তা বুঝতে না পারলেও মাতৃভক্ত সাধক রাজা রামকৃষ্ণের বুঝতে বাকী ছিল না, তাই তিনি আনন্দবিহ্বল হয়ে উচ্চকণ্ঠে গান ধরলেন—

কার রমণী সমরে বিরাজে।
কে গো লজ্জারূপা দিগম্বরী
অসুর সমাজে ॥
মায়ের পদতল-বরণ
জিনি তরুণ-অরুণ
নখরে নিশাকর লুকাইল লাজে ॥

রাজার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে ঃ আজ তাঁর কি সৌভাগ্যের দিন ঃ জননী জগদম্বায় অলৌকিক করুণালীলা এইমাত্র তিনি যে প্রত্যক্ষ করলেন! দস্যুর ত্রাস রূপে স্বয়ং অবতীর্ণা হয়ে আজ তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করলেন।

ডাকাতদের সর্দার পরদিন ভোরে দেবমন্দিরে এসে রাজা রামকৃষ্ণের চরণে লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে ভেসে ক্ষমা চাইলে। তারই মুখে শোনা গেল গতরাত্রে সে এবং তার সঙ্গীরা মায়ের আলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করেছে। পাষণ্ডদলনী মা কা'ল তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছিলেন! যতবারই তারা মন্দির আক্রমণে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে ততবারই মা রণরঙ্গিণী অসুর—সংহারিণী মূর্তি ধরে তাদের বাধা দেন, সুতরাং নিরুপায় হয়ে পলায়ন করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর থাকে না।

এই ডাকাতদের দলপতির নাম ছিল শঙ্করা। উত্তরবঙ্গে শঙ্করা-দস্যুর দলের ভয়ে লোকে একদিন থরহরি কাঁপত।

মায়ের করাল মূর্তি দেখবার পর শঙ্করা যখন রাজা রামকৃষ্ণের পদানত, তখন তার সে আসুরিক মূর্তি আর নেই, সে তখন বলতে থাকে, মহারাজ, আমার জানা ছিল কয়েকজন মন্দিররক্ষী মাত্র এখানে আছে, সুতরাং আমি আমার দুর্ধর্ষ দলের সাহায্যে অতি অনায়াসে মন্দিরের ধন লুঠ করতে পারব। তখন কি ভাবতে পেরেছি শিষ্টের পালন করতে দুষ্টকে যিনি সংহার করেন তিনিই আপনার হয়ে লড়াইয়ে নামবেন? আজ বুঝেছি আপনার চরণ আমার সব চেয়ে বড় আশ্রয়।

শঙ্করার মুখে সকল কথা শুনে নয়নজলে রাজার বুক ভেসে যেতে লাগল। শঙ্করাকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে তিনি বললেন, ভাই, তোমার সৌভাগ্যের সীমা-পরিসীমা নেই: জগজ্জননীকে তুমি অসি ধরিয়েছ, এখানে অবতীর্ণ করিয়েছ। তোমার সব অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম, এখন থেকে মায়ের গুণ গেয়ে তুমি দিন কাটাও।

রাজা রামকৃষ্ণের প্রভাবে দস্যুনেতা শঙ্করার জীবনে ঘটল এক অপূর্ব রূপান্তর।

° ° ° °

অমবস্যার নিশীথ রাত্রি। চতুর্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। জয়কালীর মন্দিরে বসে রাজা রামকৃষ্ণ মহাশক্তির আরাধনায় রত। ক্রিয়া-অনুষ্ঠান যা সব করবার ছিল তা করা হয়ে গিয়েছে। কারণ—বারি পানে দু'নয়ম তাঁর ঢুলু ঢুলু। বার বার রক্তজবা আর বিল্বদল তিনি মায়ের চরণে অর্ঘ্য দিচ্ছেন আর তাঁর কণ্ঠ থেকে ঘন ঘন উত্থিত হচ্ছে মা, মা, মা।

এরপর রামকৃষ্ণ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন, কাছে রইলেন শুধু মন্দিরের পুরোহিত, আর রইল তাঁর প্রিয় অনুচর ভোলা।

এই গভীর রাত্রে মন্দির—প্রাঙ্গণে দেখা দিলেন দণ্ড-কমণ্ডলু-

ত্রিশূল-ধারী দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী।

মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

সন্ন্যাসী আশীর্বচন উচ্চারণ করে বললেন, আমি রাজা রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে চাই, এক্ষুনি আমার এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো।

সেবক ভোলানাথ মন্দিরের দ্বার আগলে দাঁড়িয়ে, সে বিনীত-ভাবে বললে, প্রভু, মহারাজ এখন ধ্যানাসনে উপবিষ্ট, এখন ত তাঁর ধ্যানবিঘ্ন করে তাঁকে কোন কথা বলার উপায় নেই আমাদের, আপনি দয়া করে ভোরে এসে আপনার যা বক্তব্য তাঁকে বলবেন।

শুনে ক্রোধে মহাপুরুষের চোখদুটি যেন জ্বলে উঠল, তিনি তখনই তাঁর দণ্ড কমণ্ডলু বাঘছাল সব গুটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মন্দিরে চত্বর থেকে চীৎকার করে বলে উঠলেন, ধিক, ধিক, শত ধিক তোমায়, রাজা রামকৃষ্ণ, তোমার এত অধঃপতন হয়েছে? তুমি কি ছিলে, কি তোমার সত্যকার পরিচয় এর মাঝেই ভুলে গেলে? পূর্বকথা স্মরণ করবার একবার চেষ্টা কর,—এই মায়ার বাঁধন ছিন্ন কর।

নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে সন্ন্যাসীর এই বজ্রগম্ভীর বাণী চারিদিক সচকিত করে তুললে। পরক্ষণেই সন্ন্যাসী সেখান থেকে অন্তর্হিত হ'লেন।

এদিকে রাজা রামকৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন থাকলেও এ উদ্দাত্ত কণ্ঠস্বরে তিনি চমকে উঠলেন: এ গম্ভীর নিশীথে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে কে তাঁকে এমন ভৎর্সনা করে গেল। এ যে তাঁর বড় পরিচিত কণ্ঠস্বর!

ধ্যান ভেঙে গেছে তাঁর, ত্রস্তব্যস্ত হয়ে তিনি বাইরে এসে ভোলাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কে এসেছিলেন, কে ডাকলেন আমায় এমনি করে?

এক সন্ন্যাসী।

কোথায় গেলেন তিনি, খোঁজ তাঁকে।

অমাবস্যার অন্ধকারে সন্ন্যাসীকে খুঁজে বের করা অবশ্য সম্ভব হ'ল না, কিন্তু রামকৃষ্ণের কানে তখনও তাঁর বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হচ্ছে : এই মায়ার বাঁধন ছিন্ন কর।

আবারও এই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটল তাঁর জীবনে, কিন্তু এবার পরোক্ষে। কে এই রহস্যময় সন্ন্যাসী ?

রাজা রামকৃষ্ণ কয়েকজন পণ্ডিত এবং অমাত্য পরিবৃত হয়ে বসে আছেন এমন সময় এক শীর্ণকায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, হাতে তার একখণ্ড প্রস্তর। প্রস্তরটি তিনি রাজার হাতে দিলে রাজা লক্ষ্য করলেন—প্রস্তরে হেঁয়ালির মত কি যেন সব লেখা। বুঝলেন এর মাঝে রহস্য আছে।

সভায় পণ্ডিত ও অমাত্যদের মাঝে বসে প্রস্তরে লেখা সাংকেতিক লিপি পাঠ করে তিনি ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর, এ পাথরের টুকরোটি আপনি কোত্থেকে আনলেন ?

বাগসরের শ্মশানের কাছে যে জঙ্গল আছে সেখান থেকে ?

কে দিয়েছেন ?

জটাজুটধারী দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী।

রাজা রামকৃষ্ণ তখন আর ধৈর্য ধরতে পারছেন না, বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, ঠাকুর, লুকোবেন না কিছু, কি ব্যাপার সব খোলসা করে বলুন।

সব খুলেই বলছি, মহারাজ। মহারাজ, আমি বড় গরিব, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করতে না পেরে জীবনে ধিক্কার এসে গিয়েছিল। গলায় ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করব বলে ঐ জঙ্গলে এসেছিলাম।

তারপর ?

গলায় ফাঁস লাগাব এমন সময় সেখানে আবির্ভাব ঘটল ঐ সন্ন্যাসীর। তিনি আমায় প্রবোধ দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করে এটি দিয়ে বললেন, তুমি এই সঙ্কেতলিপি নিয়ে রাজা রামকৃষ্ণের কাছে যাও, তা হ'লেই তোমার দারিদ্র্য ঘুচবে।

প্রস্তর খণ্ডে যা লেখা ছিল তা এই—

যদুপতেঃ কঃ গতা মথুরাপুরী ।
রঘুপতেঃ কঃ গতোত্তরকৌশলা ॥
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং ।
ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

বৈষ্ণবাচার্য রূপ গোস্বামী তাঁর ভাই সনাতনের আধ্যাত্মিক মঙ্গলাকাংক্ষী হয়ে এই সঙ্কেত-লিপিটিই পাঠিয়েছিলেন ।

রাজা রামকৃষ্ণ অবিলম্বে সমাগত ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য মোচনের আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু মন তখন তাঁর এই বাস্তব জগতে নেই। তখনই সভা ভঙ্গ করলেন তিনি। তাঁর অদ্ভুত আনমনা ভাব দেখে অমাত্যদের কেউ আর তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস করল না।

শ্লোকের প্রত্যেকটি চরণ মহারাজের সারা অন্তরকে আলোড়িত করে তুলতে লাগল। কিন্তু কে এই অলক্ষ্যে সঞ্চরমান সন্ন্যাসী—যিনি তাঁর সংসার বন্ধন মোচনের জন্য অনুসরণ করে চলেছেন !

সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানের জন্য বহু লোক নিযুক্ত করা হ'ল, কিন্তু তাঁর সন্ধান আর কিছুতেই মিলল না। রাজা রামকৃষ্ণ দিব্যোন্মাদের মত শ্মশানে আর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। রাণী ভবানী তখন পুত্রের উপর বিষয়ের ভার দিয়ে কাশীবাস করছেন।

দানধর্মে রাজভাণ্ডার ক্রমে শূন্য হয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামকৃষ্ণের কীর্তিযশ দ্রুত বৃদ্ধির পথে। হঠাৎ সংবাদ এল বাদশাহ নাটোরাধিপতিকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' খেতাব দিয়েছেন। বাদশাহ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা রাজাকে সনদ দিতে নাটোরে এসেছেন। রাজধানীতে সুরু হ'ল উৎসবের আয়োজন।

আবার সেই রহস্যময় সন্ন্যাসীর আবির্ভাব।

উৎসবের শোভাযাত্রা। নাটোরের রাজপথে, রাজা রামকৃষ্ণ চলেছেন তার মাঝে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে। পথের এক পাশে

দিব্যকান্তি তেজোপুঞ্জকায় এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। রাজার দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়তেই সন্ন্যাসী তাঁকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। রাজা রামকৃষ্ণ তখনই নেমে এলেন হাতীর পিঠ থেকে। চিত্ত তখন আলোড়িত: ইনিই কি সেই রহস্যময় পুরুষ যিনি জয়কালী মন্দিরে তাঁকে ভর্ৎসনা করে গেছেন। ইনিই কি সেই আমার কল্যাণকামী মহাপুরুষ—এই কিছুদিন আগে যিনি প্রস্তরে লেখা সংকেত-লিপি পাঠিয়েছিলেন? অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে বারবার তাঁকে অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন যে মহাত্মা—ইনিই কি তিনি?

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে এবার তাঁর আত্মপরিচয় পেলেন রাজা রামকৃষ্ণ। সন্ন্যাসী ভারতের সাধক সমাজে শ্রীজী নামে পরিচিত। জন্ম এঁর রাজপুতনার বুঁদি বংশে। যৌবনেই মুমুক্ষার আহবানে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তারপর এক মহাযোগীর আশ্রয়ে সিদ্ধকাম হ'ন।

দু'জনে সেদিন নগরের উপান্তে এক নিরালা প্রান্তরে এসে উপবেশন করলেন। শ্রীজী বহুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে রাজা রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ আরও নিকটে ঘেঁষে হাত দিয়ে রাজার মেরুদণ্ডটি স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার দেহে এক বিদ্যুৎ শিহরণ বয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠল এক বিস্ময়কর দৃশ্য; পুণ্যক্ষেত্র হরিদ্বার। তারই এক পর্বতগুহায় তিনি উপবিষ্ট, আর সম্মুখে তার গুরু এবং প্রবীন গুরুভ্রাতা ধ্যানময়। এই গুরু ভ্রাতাই এবারকার শ্রীজী। সে জীবনে ইনি ছিলেন তার নিত্য সহচর, তার অধ্যাত্ম সাধনার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দুইজনের সাধক জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল ক্ষীণ ভোগাকাঙ্ক্ষা। সদ্‌গুরুর দিব্যদৃষ্টিতে তা এড়ায় নি। দুই শিষ্যেরই আবার জন্ম নিতে হয়েছে। নিজের বন্ধন মুক্তির পর বারবার ছুটে আসছেন তিনি পূর্বজন্মের গুরুভাইয়ের মুক্তির জন্য।

রহস্যময় মহাপুরুষ যেভাবে এসেছিলেন সেইভাবেই আবার অন্তর্ধান করলেন।

রাজা রামকৃষ্ণ এবার সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

যোগত্রয়ানন্দজী

★ ★ ★ ★ ★ ★

যোগীরাজ শিবরাম স্বামী এসেছেন বালীতে—হাওড়ার কাছে গঙ্গাতীরে। দেহটা কিছুদিন যাবৎ মোটেই ভাল যাচ্ছে না, তাই এবার এটা ত্যাগ করবেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। খবরটা কানে যেতে নানা স্থান থেকে ভক্ত শিষ্যেরা ছুটে আসছেন তাঁর কছে তাঁর শেষ দর্শনের জন্য।

প্রবীণ শিষ্য কালীনাথ বালীরই লোক, তাই রোজই তাঁর যাতায়াত গুরুদেবের কাছে। একদিন তাঁর প্রিয় ভাতুষ্পুত্র শশী-ভূষণকে সঙ্গে নিয়ে এসে গুরুর চরণে দণ্ডবৎ করার পর শশীকে দেখিয়ে বললেন, বাবা, এ আমার ভাইপো, নাম শশী। আপনি ওর প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি করুন—এই প্রার্থনা। নয় বৎসর বয়সে ওর উপনয়ন হয়, তার পর থেকেই ওর এক দুরন্ত মূর্ছা রোগ, এ রোগ কিছুতেই সারানো গেল না। কত ডাক্তার কবিরাজ দেখানো হল কেউই কিছু করতে পারলেন না। এবার ওকে আপনার চরণতলে রেখে দিচ্ছি, আপনি ওকে কৃপা করুন।

বালক শশী এরপর এগিয়ে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে যোগীবর প্রসন্ন মধুর হাস্যে তাকে কাছে ডেকে এনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে স্পর্শ করলেন তার মেরুদণ্ড। এই স্পর্শে বালক ধীরে ধীরে সম্বিৎ হারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দেখে শুধু কালীনাথ নয় গুরুজীর অন্যান্য শিষ্যেরাও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শিবরাম স্বামীকে কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখা গেল না, তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি শুধু

বললেন, ওকে সন্তর্পণে ঘরের এক ধারে সরিয়ে রাখ, একটু বিশ্রাম করুক।

এ আদেশ তখনই পালিত হ'ল। গুরুজী সুরু করলেন এবার তত্ত্বালোচনা ঃ কেনোপনিষদের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝাতে লাগলেন তিনি ভক্তদের।

ব্যাখ্যান শেষ হ'লে যোগীবর বললেন, তোমরা বালক শশীকে একবার দেখ ত! ওর বাহ্যজ্ঞান এতক্ষণ ফিরে এসেছে। ওকে আমার সামনে নিয়ে এস।

বালককে তুলে আনা হ'লে শিবরামানন্দজী তার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, শশী, এবার তুমি বলো ত—আমি এখানে বসে এতক্ষণ এদের কি বুঝাচ্ছিলাম?

যোগীবরের কথায় শশী সোজা হয়ে বসল, চোখেমুখে তার যেন এক বিদ্যুতের দীপ্তি। যোগীবর এতক্ষণ উপনিষদের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন শশী শান্ত ধীর কণ্ঠে তার সারমর্ম বিবৃত করে গেল। শুনে উপস্থিত সকলে ত একেবারে বিস্ময়ে হতবাক্।

শিবরামানন্দজী এবার কালীনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার ভাইপোর জন্য আর কোন ভয় নেই, ওর রোগ চিরতরে সেরে গেছে। ওর যে মূর্ছা হত,—আসলে সেটা মূর্ছা রোগ নয়, ওটা ছিল ওর পূর্বজন্মের সংস্কারজাত একটা ধ্যানাবেশ। বিস্মৃতির পাথরে এতকাল এটা চাপা পড়ে ছিল, আজ খুলে দিলাম।

যোগীবর এরপর প্রসন্ন কণ্ঠে কালীনাথকে বললেন, তোমার শশীকে আমি দীক্ষা দেবো, বয়সে বালক হ'লেও ও এর মাঝেই যোগ্য আধার, এরপর বালকের দিকে চেয়ে বললেন, আরে শশী, তুই ত আমার তত্ত্ব আলোচনার মর্ম চমৎকার বুঝিয়ে দিলি, তুই দেখছি এর মাঝেই মহাপণ্ডিত, এখন থেকে তোকে আমি পণ্ডিত বলেই ডাকব।

পরদিনই শশীর দীক্ষা হয়ে গেল। গুরু কৃপায় শশী অতি অল্প

বয়সেই জ্ঞান, কর্ম, এবং ভক্তি—সাধনার এই তিন দিকেই এমন উচ্চাবস্থা লাভ করেন যে গুণমুগ্ধ ভক্তসাধকেরা তাঁকে যোগত্রয়ানন্দ আখ্যা দেন।

সংসার ত্যাগ করেন নি শশী, সংসারে থেকেই তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির অতি উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছেন।

* * * *

গুরু শিবরামানন্দের কৃপায় এবং পূর্ব জন্মের অর্জিত পুণ্যবলে শশীভূষণ অনেক সময় সূক্ষ্মদেহধারী মহাত্মা ও দেব-দেবীর দর্শন লাভ করতেন।

প্রথম দিকের কথা। ঋষিশাস্ত্র ভাল করে অধ্যয়ন করবেন বলে পতঞ্জলি-কৃত পাণিনির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন শশীভূষণ। এই উদ্দেশ্যে নিয়ে গেলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দক্ষিণী পণ্ডিত গোবিন্দ শাস্ত্রী ভরদ্বাজের কাছে। নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যাত হলেন। শাস্ত্রীজী বললেন, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছাড়া বাইরের কোন ছাত্রের অধ্যাপনা করি নে আমি। সে ইচ্ছাও নেই, সময়ও নেই। শশীভূষণের অনেক অনুনয় বিনয়েও শাস্ত্রীজীর মন নরম হ'ল না, তিনি বরং তাঁকে কটূক্তি করে তাড়ালেন।

এই রূঢ় প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত হয়ে তিনি ফিরে এসে অন্নজল ত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ঠাকুরের কাছে তাঁর কেবলি প্রার্থনা জাগতে থাকল,—হে প্রভু দেবাদিদেব, তুমি ত জান, নিজের স্বার্থের জন্য আমি ব্যাকুল হয়নি, ঋষি-শাস্ত্র পড়ে ত্রিতাপ-তাপিত লোকের কল্যাণ করব বলেই আমি তার চাবি কাঠি হাতড়ে বেড়াচ্ছি। যা'ক খুব শিক্ষা হ'ল, এবার থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য আমি আর কোন মানুষের কাছে ভিক্ষা করতে যাব না, একান্ত ভাবে তোমার কৃপার উপরই নির্ভর করব।

মনোদুঃখে সারাদিন আর কোন অন্নজল গ্রহণ করলেন না শশীভূষণ। গভীর রাত্রে পূজার ঘরে বসে নিবিষ্ট মনে জপ করছেন

এমন সময় দেখেন হঠাৎ তাঁর ক্ষুদ্র কক্ষটি দিব্য আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর এ কি! তারই মাঝে অদূরে দাঁড়িয়ে জটাজুট-মণ্ডিত এক ঋষিকল্প মহাপুরুষ।

শশীভূষণ ত ব্যাপার দেখে একেবারে 'থ'। তিনি ত ঘরের দ্বার বন্ধ করেই পূজায় বসেছেন, এ বৃদ্ধ তাপস কি করে তাঁর ঘরে ঢুকলেন? শশীভূষণ যখন এই রকম সব ভাবছেন এমন সময় মহাপুরুষ তাঁর দিকে প্রসন্ন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে মধুর কণ্ঠে বললেন, বৎস, তুমি এমন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছ কেন? সারাদিন অন্নজল গ্রহণ কর নিই বা কেন? শাস্ত্রী তোমার জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেন নি বলে? তুমি কি জান না, প্রকৃত জিজ্ঞাসু একনিষ্ঠ সাধকের জ্ঞান পিপাসা স্বয়ং ভগবানই ত মিটান। হতাশ হয়ো না তুমি, আমিই তোমার পাণিনি ভাষ্যের রহস্য শিক্ষা দেব। আমি যা রচনা করেছি তা শিক্ষা দেবার সামর্থ্য আমার নিশ্চয়ই আছে।

মহাত্মার মুখে এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে শশীভূষণের বুঝতে বাকী রইল না—ইনি হচ্ছেন স্বয়ং ঋষি পতঞ্জলি। শশীভূষণ তখনই উঠে মহাপুরুষকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন।

ঋষি আর কালবিলম্ব না করে তখনই শশীভূষণের কাছে মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা শুরু করলেন। জিজ্ঞাসু সাধকের কাছে অতি অল্প কালের মাঝেই ভাষ্যের সকল তত্ত্ব, সকল রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়ে গেল!

ঋষির আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বড় বেশী ছিল না। এই অত্যল্প কালের মধ্যে দুরূহ মহাভাষ্যটি সম্পূর্ণরূপে কি করেই বা ব্যাখ্যা হ'ল?—এই কথা শশীভূষণের মনে জাগতেই তার উত্তরটাও তখনই তাঁর মনে এসে গেল। তিনি উপলব্ধি করলেন—সাধারণ জীবজগৎ কালের যে মানে অবস্থিত থাকে শক্তিধর বিদেহী মহাপুরুষদের কালের মান তা থেকে অনেক বেশি সূক্ষ্মতর। তাঁদের কৃপায় যে কোন দেহধারী মর্ত্যবাসী বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার ক্ষণকালের মধ্যে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

ঋষির জ্ঞান সত্যিই তিনি লাভ করতে পেরেছেন কিনা তা পরীক্ষা করতে তিনি তখনই গ্রন্থ খুলে পাঠ করতে সুরু করলেন। আশ্চর্য—তিনি দেখলেন আগে যে সব সূত্রে তিনি দন্তস্ফুট করতে পারতেন না সে সবের নিহিতার্থ এখন তাঁর কাছে জলের মত সহজ হয়ে উঠেছে।

দৈবী কৃপালাভ শশীভূষণের জীবনে মাত্র এই একবারই ঘটে নি। আর একবার শিবরাত্রির মহানিশায় ঋষি গৌতমের কৃপায় সমগ্র ন্যায়দর্শনের তত্ত্ব তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে সমর্থ হ'ন।

পতিব্রতা, ত্যাগবৈরাগ্য ও তপঃশক্তির সঙ্গে শশীভূষণের জীবনে ঋষিরচিত শাস্ত্রের মর্মোদ্ঘাটনের যে ব্যাকুলতা দেখা দিয়েছিল তারই ফলে সূক্ষ্মলোকচারী মহাত্মাদের কৃপালাভ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়।

• • • •

মহাসাধক যোগত্রয়ানন্দ সংসারী হ'লেও সংসার যাত্রা নির্বাহ করতেন তিনি অযাচক বৃত্তির উপর নির্ভর করে একান্তভাবে—সম্পূর্ণ রূপে। ভক্ত, শিষ্য, গুণগ্রাহী, উপকৃত অনুগৃহীতের সংখ্যার তাঁর অবধি ছিল না, কিন্তু নিতান্ত অভাবে পড়েও তাঁর এ বৃত্তি তিনি ত্যাগ করতেন না। এর ফলে মাঝে মাঝে অলৌকিক ভাবে কেমন তিনি ভগবদ্‌কৃপা লাভ করতেন তার একটিমাত্র দৃষ্টান্তের শুধু এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

সেদিন গৃহিনী এসে জানালেন—ঘরে এক মুষ্টি তণ্ডুল নেই। মুদী বাকীতে আর মাল দিতে চাইছে না, ঘরে একটি টাকাও নেই। এখন উপায়?

মহাত্মা আকাশের দিকে আঙুল তুলে বললেন, আমরা তাঁর চরণে শরণ নিয়েই আছি, তিনি রাখতে হয় রাখবেন মারতে হয় মারবেন। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর, একটা কিছু হবেই।

বললেন বটে—কিছু হবেই, কিন্তু সেদিন আর কিছু হ'ল না। তার আদেশে সে দিন বাড়ির সকলকে বেলপাতার রস খেয়ে কাটাতে

হ'ল। শুধু সেদিন নয়, এর পর আরও দু'দিন সবার অনাহারে কেটে গেল। বাড়িতে যখন এই চরম দুর্গতি তখনও যোগত্রয়ানন্দ তার পাঠকক্ষে বসে হয় গ্রন্থরচনা না হয় ভক্ত সাধনার্থীদের নিয়ে তত্ত্ব আলোচনায় রত, দর্শনার্থীদের কাউকেই তিনি তার দুর্গতির কথা জানতে দেন নি।

তিন দিনের দিন বিকেলে কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) প্রভৃতি ভক্তেরা তার গৃহে এসে সমবেত হয়েছেন। যোগত্রয়ানন্দ প্রশান্ত কণ্ঠে তাদের কাছে একটি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন এমন সময় ডাকপিওন এসে তাকে একটা রেষ্ট্রীকরা ইনসিউরড্ খাম বিলি করে গেল।

যোগত্রয়ানন্দ খামটি খুলে তার ভিতরকার চিঠিটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি ঊর্দ্ধ'দিকে নিবদ্ধ হয়ে নিস্পন্দ হয়ে গেল, দুই গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ভক্ত ও শিক্ষার্থীরা অবাক হয়ে মহাত্মার দিকে চেয়ে রইলেন, এমন দৃশ্য তাদের আর কোনদিন চোখে পড়ে নি। মহাত্মার এই অবস্থা দেখে কেউ আর কোন কথা বলতেও সাহস পাচ্ছেন না। প্রায় পনের মিনিট কেটে যাবার পর কালীপ্রসাদ (অভেদানন্দ) নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলেন, বাবা, ব্যাপার আমরা ত কিছু বুঝে উঠছি না। আপনার চোখে ত আমরা কোনদিন জল দেখিনি ঃ সকল সুখ দুঃখের অতীত আপনি—এই কথাই আমরা জানি। চিঠিতে এমন কি দুর্দৈবের খবর এল যে তাতে আপনি এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন ? আপনার চোখে জল দেখে আমরা বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

কালীপ্রসাদের কথায় মুখ খুললেন যোগত্রয়ানন্দ ; বললেন, তোমরা আমার চোখ থেকে যে জল ঝরতে দেখলে এ কোন শোকের অশ্রু নয়, আনন্দের। শোক আমাকে কখনও কাবু করতে পারে না, কাঁদাতে পারে না। কান্না পেয়েছে আমার শ্রীভগবানের করুণার কথা মনে করে। আমার এই পত্রখানা তোমরা পড়ে দ্যাখো, তা হলেই বুঝতে পারবে।

সবার সামনেই পাঠ করা হ'ল পত্রখানা। লিখেছেন কাশীর চৌখাম্বা মহল্লার এক সম্ভ্রান্ত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। চিঠির মর্ম এই—

ভদ্রলোক আগের দিন রাত্রে এক স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্নে বাবা বিশ্বনাথ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেন, আমি উপবাসী, অন্নজল কিছুই গ্রহণ করা হয় নি আমার, শীগগির আমার জন্যে অন্নের ব্যবস্থা কর। আমার এক পরম ভক্তের অন্ন জোটেনি, তাই আমাকেও উপবাসে কাটাতে হচ্ছে। আমার উপর তোমার যদি বিন্দুমাত্র ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে তা হ'লে তিলমাত্র বিলম্ব না করে তাঁর অন্নগ্রহণের ব্যবস্থা করো।

শুধু এই নয়, বাবা বিশ্বনাথ কাশীর ঐ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকানা জানিয়ে দিতে ভুল করেন নি। স্বপ্নের মধ্যেই ভদ্রলোকের চোখের সামনে উপবাসী ভক্তের নাম ঠিকানা উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় অক্ষরে প্রকট হয়ে ওঠে, আর প্রত্যাদেশ পাওয়া ভদ্রলোক সেই অনুসারে যোগত্রয়ানন্দের ঠিকানায় এই খাম পাঠান। খামের মাঝে রয়েছে সুদীর্ঘ একটি চিঠি এবং পাঁচশো টাকার নোট।

পত্রপ্রেরক সর্বশেষে লিখেছেন তাঁর বিশ্বাস বাবা বিশ্বনাথের স্বপ্নাদেশ ব্যর্থ হবার নয়, তাঁর প্রেরিত অর্থ যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছবে।

পত্র পড়া শেষ হ'লে যোগত্রয়ানন্দ তাঁর ঘরের কথা সবিস্তারে উপস্থিত সকলকে খুলে বললেন। এ কথা তাঁর বেশ ভাল ভাবেই জানা—তাঁর এমন বহু ভক্ত আছেন যাঁরা ঘুণাক্ষরে এ কথা জানলেই এর একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু তা চান নি তিনি। তিনি একান্ত ভাবেই শ্রীভগবানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বকরুণার উৎস, তার ইচ্ছা হ'লে ত এক মুহূর্তে সর্ব অভাব মোচন হ'তে পারে। আর সত্যি সত্যি তাই হ'ল। করুণাময়ের এই লীলা দেখে তিনি আজ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তার চোখে আজ এই পুলকাশ্রুর ধারা।

গোস্বামী শ্যামানন্দ

★ ★ ★ ★

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের উৎসারিত প্রেমভক্তির বন্যায় বাংলা উড়িষ্যা যখন প্লাবিত হচ্ছে তখনকার কথা।

উভয় দেশের বৈষ্ণব সমাজে কালনার হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের তখন খুব নামডাক। এই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে উড়িষ্যার ধারেন্দা বাহাপুর থেকে এক মুমুক্ষু কিশোর পদব্রজে কালনায় এসে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণের অভিলাষ জানাল।

তোমার নাম কি?

আজ্ঞে—দুঃখী।

কিশোরের মুখে চোখে হাবেভাবে দৈন্য ও আর্তির ছাপ দেখে হৃদয়-চৈতন্যের হৃদয়ে একসঙ্গে স্নেহ ও করুণা দুই ই জেগে উঠল। তিনি তাকে দীক্ষা দিয়ে তার নাম রাখলেন দুঃখী কৃষ্ণদাস।

শিষ্যের বৈষ্ণবসুলভ দৈন্য বিনয়, আর্তি আচার ও সেবানিষ্ঠা দেখে হৃদয়চৈতন্যঠাকুর বুঝলেন এর মাঝে রয়েছে প্রেমভক্তি সাধনার বিরাট সম্ভাবনা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করাবার জন্য গুরু পাঠালেন তাকে ব্রজমণ্ডলে আচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে, সঙ্গে এক অনুরোধপত্র।

জহুরী জহর চেনে। অসামান্য বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রতিমূর্তি দুঃখী কৃষ্ণদাসকে দেখেই শ্রীজীব বুঝলেন এ এক উপযুক্ত আধার।

অতঃপর শ্রীজীবের কাছে চলে নিয়মিত বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থপাঠ। নিজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং শ্রীজীবের শিক্ষাদানগুণে অতি অল্পদিনের মাঝেই তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

পাণ্ডিত্য অধ্যাত্ম সাধনার বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায় না সাধক জীবনে এ

সৌভাগ্য বড় বিরল। কিন্তু দুঃখী কৃষ্ণদাস এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'ন নি।

শ্রীজীবের কুটীরে নিয়মিত ভক্তিশাস্ত্র পাঠের সঙ্গে সমানে চলেছিল তাঁর সাধন ভজন ও বিগ্রহ সেবা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সেবাই ভক্তি শাস্ত্রের চরম লক্ষ্য, তাই সেবাকার্যে তিনি সর্বদাই থাকতেন তৎপর। ব্রজধামের নিকুঞ্জ-মন্দিরে তিনি রোজ ঝাড়ুদারের কাজ করতেন। তাঁর অন্তরে বড় আশা একদিন তিনি রাধারাণীর কৃপালাভ করবেন, তাঁর চরণ দর্শন করে জীবন ধন্য করতে পারবেন।

মন্দির অঙ্গন তিনি বারবার ঝাঁট দেন, আর এই সময়ে স্মরণে জাগে রাধাগোবিন্দের দিব্যলীলা, বিশেষ করে এই সময় বৃদ্ধি পায় তাঁর শ্রীরাধার দর্শনাকাংক্ষা।

দিনের পর দিন তাঁর এইভাবে মন্দির মার্জন চলে, তারপর একদিন রাত্রির তখন শেষ যাম—দুঃখী কৃষ্ণদাস ঘুম থেকে উঠে ঝাঁটা হাতে নিকুঞ্জ মন্দির পরিষ্কার করছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল আঙিনার এক কোণে কি একটা চকচকে জিনিস পড়ে রয়েছে!

কাছে গিয়ে দেখেন আরে—এ যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঃ এ যে এক অপরূপ সুন্দর সোনার নূপুর। নূপুরটি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন তিনি, দেহে জাগল সাত্ত্বিক বিকার, তারপর সেটা হাতে তুলতে গিয়ে দেখেন তা থেকে এক দিব্য সৌরভও বের হচ্ছে। তা হলে এ তো কোন প্রাকৃত বস্তু নয়!

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তরের নিভৃত অন্তস্তল থেকে কে যে বলে উঠল, ওরে দুঃখী, মহাভাগ্যবান তুই, পেয়েছিস আজ তুই প্রিয়াজীর চরণ নূপুর।

দুঃখী কৃষ্ণদাসের দু'চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়তে লাগল ঃ ওঃ কৃপময়ী রাধে!

কিন্তু একি, বিস্ময়ের উপর যে আবার বিস্ময় ঃ একটি পরমা-

সুন্দরী কিশোরী মেয়ে দ্রুতপায়ে নিকুঞ্জ মন্দিরের দিকে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি এসেই দুঃখী কৃষ্ণদাসকে জিজ্ঞাসা করে, এ ভাইয়া, একঠো সোনেকো নূপুর তুমকো মিলা ?

কৃষ্ণদাস পুলকাঞ্চিত দেহে উত্তর দেন, হ্যাঁ গো, নূপুর তো একটা পেয়েছি, কিন্তু এটা কার নূপুর বলতে পার ?

এর উত্তরে কিশোরী যা বললে তার মর্মার্থ হচ্ছে কা'ল রাত্রে তার সঙ্গিনীর একটা সোনার নূপুর এখানে হারিয়ে গিয়েছে। তিনি বড় ঘরের মেয়ে, রাজনন্দিনী, বয়সে তরুণী, তাই হঠাৎ কোন লোকের সামনে আসতে তাঁর বড় সঙ্কোচ। তাই তাকে পাঠিয়েছেন তিনি খোঁজ করতে।

মনে একটা ফন্দি এঁটে দুঃখী কৃষ্ণদাস বললেন, বেশ ভাল কথা, কিন্তু সত্যি কথা বলছ কি না তা আমি কি করে বুঝব ? যাঁর নূপুর তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস। নূপুর তাঁর চরণে লাগিয়ে দেখি, ঠিক ঠিক লাগে তবেই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব। নূপুর যদি সত্যিই তোমার সখীর হয়, তবে নিজে হাতে এটি আমি তাঁর চরণে পরিয়ে দেব, নইলে পাবে না।

কৃষ্ণদাস তাঁর সংকল্পে অটল বুঝে কিশোরী তখনই অন্তর্হিত হ'ল, একটু পরেই আবার ফিরে এল, সঙ্গে এবার তার রাজনন্দিনী সখীটি।

নবাগতার অঙ্গের দিব্য আভায় চারিদিক উদ্ভাসিত। দুঃখী কৃষ্ণদাস নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, সারাদেহে তাঁর রোমাঞ্চপূর্ণ পুলক।

এরপর কৃষ্ণদাস প্রশ্ন করলেন, তোমরা দুই সখী গভীর রাত্রে এ নিকুঞ্জ মন্দিরের আঙিনায় কেন এসেছিলে, তা আমায় বলো, নইলে কিছুতেই নূপুর মিলবে না।

নূপুরের অধিকারিণী নবাগতা নিজেই সুধাস্রাবী কণ্ঠে এর উত্তর দিলেন, মঁয় বহুৎ ক্যা কহুঁ ? ইয়ে তো মেরা নিকুঞ্জ মন্দির হ্যায়।

অব্ তুম্ সব্ সমঝ্ লেও। জ্যাদা হট না করো। দেখো সুবহ্ হোনেকো আয়া। মেরা নূপুর তো লওটা দো।

নবাগতার মুখে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদাসের নয়নের আবরণ যেন চকিতে খুলে গেল, সর্বসত্তা দিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান এই রাজনন্দিনী আর কেউ ন'ন, স্বয়ং কৃষ্ণপ্রিয়া বৃষভানুনন্দিনী রাধারাণী। সঙ্গিনী তাঁরই সখী ললিতা। বুঝলেন হারানো নূপুর পুনরুদ্ধারের ছলে দুঃখী কৃষ্ণদাসের উদ্ধারের জন্যই প্যারীজীর এ কারুণ্য-লীলা!

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কৃষ্ণদাস এবার যুক্তকরে সকাতরে প্রার্থনা জানালেন যদি এ অধমকে এত কৃপা করলেই, তবে নিজের স্বরূপ দেখিয়ে এ দাসকে কৃতার্থ কর, দেবী।

রাধারাণী স্মিতহাস্যে বললেন, ইন্ আঁখোসে মেরা সত্য রূপ তুম্ ক্যা দেখ সকোগে?

দুঃখী কৃষ্ণদাসের অশ্রু আর আর্তিতে ললিতার হৃদয় করুণার্দ্র হয়ে উঠেছে, তিনিই এবার মুখ খুললেন, প্যারীজী, অব্ তুমহারী কৃপা হুই হ্যায়, তো থোড়ি শকৃতি ভি দান করো।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত মধ্যে উন্মোচিত হ'ল কৃষ্ণদাসের নয়নসমক্ষে অতীন্দ্রিয় লোকের সিংহদ্বার, কৃষ্ণদাস দর্শন করলেন শ্রীগোবিন্দের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ।

শুধু চকিতের দর্শন। এরই মাঝে প্যারাজী কৃষ্ণদাসকে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, তোমার একনিষ্ঠ সেবা এবং ঐকান্তিকী ভক্তিতে আমি প্রসন্ন হয়েছি। আমার আশীর্বাদের চিহ্ন স্বরূপ এ নূপুরচিহ্নিত তিলক তুমি তোমার ললাটে ধারণ কর—এই বলে শ্রীধামের রজলিপ্ত নূপুরটি ভক্তের ললাটে স্পর্শ করিয়ে প্যারীজী তাঁর সঙ্গিনী সব সেখান থেকে অন্তর্হিতা হ'লেন।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণদাস সম্বিৎ হারিয়ে হ'লেন ভূলুণ্ঠিত।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে

এসে রাধারাণীর অলৌকিক দর্শন এবং কৃপার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন, শ্রীজীবের নয়নেও দেখা দিল তখন পুলকাশ্রু। তিনি কৃষ্ণদাসকে আশিস ও অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, বৎস, আজ থেকে তুমি আর দুঃখী কৃষ্ণদাস নও, তোমার নতুন নাম রাখলাম আমি গোস্বামী শ্যামানন্দ। তা ছাড়া প্যারীজীর নূপুর চিহ্নই তুমি আজ থেকে তোমার ললাটে ধারণ করবে।

সমাপ্ত